দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

ফতোয়া আর্কাইভ -২০১৬

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

সূচিপত্র

এই যুগের কলমের জিহাদই মূল জিহাদ ' এটা কতটুকু সঠিক ?? ৪

কমেন্ট ২০

দারুল হারবের বেসামরিক নাগরিক হত্যার শারয়ী বিধান একটি ফিক্বহ ভিত্তিক পর্যালোচনা..... ২২

এই যুগের কলমের জিহাদই মূল জিহাদ ' এটা কতটুকু সঠিক ??

Umar Faruq

Senior Member

১০-২২-২০১৬

প্রশ্ন-: ডঃ আসাদুল্লাহ আল গালিব সাহেব, যিনি আহলে হাদিস আন্দোলনের আমির। তিনি তার বই এ উল্লেখ করেছেন 'এই যুগের কলমের জিহাদই মূল জিহাদ', এ ব্যাপারে উনার দৃষ্টিভঙ্গি কি ইসলাম সম্মত?

উত্তরঃ

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

প্রথমতঃ ডঃ আসাদুল্লাহ গালিব সাহেবকে আল্লাহ জাযায়ে খায়ের দান করুন এ কারণে যে, তিনি অন্যান্য অনেকের মতো দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য কুফর মিশ্রিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গিয়ে সামিল হয়ে যাননি।

বিশেষতঃ অন্য অনেকের মতো 'জিহাদ' শব্দটা মুখে আনতে তিনি ভীত হননি। বরং তিনি দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে জিহাদের ব্যাপারে তার কিছু কথা অস্পষ্ট হওয়ায় আমরা সেই কথাগুলোর ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরছি ইনশাআল্লাহ।

'সমাজ বিপ্লবের ধারা' বই এ **'জিহাদের হাতিয়ার'** অধ্যায়ে ডঃ আসাদুল্লাহ গালিব সাহেব উল্লেখ করেছেনঃ

'ইসলামের পরিভাষায় জিহাদের তাৎপর্য চিরকাল একই থাকবে। তবে জিহাদের পদ্ধতি পরিবর্তনশীল। অসিযুদ্ধ এখনই নয়। মসীযুদ্ধ অসির চাইতে মারাত্মক'।

একটু সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেছেনঃ

‘এ যুগে জিহাদের সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার হলোঃ কথা, কলম, সংগঠন। আপনাকে অবশ্যই কথা বলা শিখতে হবে। ...’

‘আন্দোলন অথবা ধ্বংশ’ অধ্যায়ে তিনি বলেছেনঃ

‘কথা, কলম, সংগঠন – জিহাদের এই ত্রিমূখী হাতিয়ার নিয়ে আমাদেরকে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।’

‘ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি’ বই এ ‘জিহাদের প্রস্তুতি’ অধ্যায়ে ২৮ পৃষ্টাতে তিনি বলেছেনঃ

‘তাওহীদ বিরোধী আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনই হলো সবচেয়ে বড় জিহাদ। নবীগণ সেই লক্ষ্যেই তাঁদের সমস্ত জীবনের সার্বিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত রেখেছিলেন।’

একই অধ্যায়ের ৩০ পৃষ্টায় তিনি বলেছেনঃ

‘অতএব শিরক ও বিদয়াতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে রুখে দাঁড়ানোই হলো প্রকৃত জিহাদ। ... তাই একই সাথে তাওহীদের ‘দাওয়াত’ ও তাওহীদ বিরোধী জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সর্বমূখী ‘জিহাদ’-ই হলো দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি।’

দ্বিতীয়তঃ ‘ইকামাতে দ্বীন’ কাকে বলে, এর অর্থ কি এসব বিষয়ের আলোচনায় তিনি সলফে সালেহীনদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, বিভিন্ন তাফসীরকারকদের বক্তব্য তুলে এনেছেন। কিন্তু ‘জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ’ এর ব্যাপারে কথা বলার সময় তিনি শুধুমাত্র নিজের বক্তব্য ও মতামত লিখেছেন। কিন্তু সলফে সালেহীনগণের, তাফসীর, হাদিস ও ফিকহের সম্মানিত ইমামগণের কোন বক্তব্য তিনি তুলে ধরেন নি। অথচ জিহাদ ফি সাবিলিল্লার ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ হাদিসের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ

قيل وما الجهاد قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم قيل فأى الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه –خرجه أحمد (114/4 ، رقم 17068) . وأخرجه أيضًا : عبد بن حميد (ص 124 رقم (301قال المنذرى (106/2) : رواه أحمد بإسناد

صحيح ، ورواته محتج بهم فى الصحيح ، والطبرانى وغيره ، ورواه البيهقى عن أبى قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه . وقال الهيثمى (59/1) : رواه أحمد ، والطبرانى فى الكبير بنحوه ، ورجاله ثقات .

অর্থাৎ, **বলা হলোঃ জিহাদ কি? তিনি বললেন, কাফিরদের সাথে লড়াই করা যখন তাদের সাথে সাক্ষাত হয়। বলা হলোঃ কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ যার ঘোড়া নিহত হয় ও রক্ত প্রবাহিত হয়।** (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, বাইহাকী, সনদ সহীহ)

এছাড়া এ ব্যাপারে সলফে সালেহীনদের বক্তব্যও সুস্পষ্ট। তিনি যদি এ ব্যাপারেও সলফে-সালেহীনদের বক্তব্য তুলে ধরতেন, তাহলে হয়তো পাঠকরা তার এসব বই পড়ে জিহাদের ব্যাপারে ভুল ধারনায় পড়তেন না।

তৃতীয়তঃ 'জিহাদ' শব্দের শাব্দিক অর্থ 'সর্বাত্বক চেষ্টা-সাধনা' হলেও ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে জিহাদ অর্থ হলোঃ

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের আরবী ভাষ্যকার ইমাম কাসতালানী (রঃ) বলেন,

قتال الكفارلنصرة الإسلام ولإعلاء كلمة الله

"জিহাদ হলোঃ দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করার জন্য ও আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য কাফিরদের সাথে কিতাল করা।"

ইমাম ইবনে হুমাম (রঃ) বলেন,

الجهاد: دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا

"জিহাদ হচ্ছে কাফিরদেরকে সত্য দ্বীন ইসলামের প্রতি আহবান করা এবং যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তাদের সাথে লড়াই করা।" (ফাতহুল ক্বাদীর ৫/১৮৭)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রঃ) বলেনঃ

وفى الشرع بذل الجهد فى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى

“শরীয়াতের পরিভাষায় জিহাদ হলোঃ আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা”। (উমদাতুল ক্বারী, ১৪/১১৫)

ইমাম কাসানী (রঃ) বলেন,

بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عزوجل بالنفس والمال واللسان وغير ذلك

“শরীয়াতের পরিভাষায় (জিহাদ হলো) নিজের জীবন, সম্পদ, মুখ ও অন্যান্য যা কিছু দিয়ে সম্ভব তার মাধ্যমে আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্য শক্তি ও ক্ষমতা উৎসর্গ করা”। (আল বাদায়ীউস সানায়ী ৯/৪২৯৯)

মালেকী মাজহাবে জিহাদের সংজ্ঞা হলোঃ

قتال المسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله، أو حضوره له، أو دخوله أرضه له

“মুসলিমের জন্য আল্লাহর আইনকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে যেসব কাফির কোন চুক্তির অধীনে নয় তাদের বিরুদ্ধে অথবা যদি তারা আক্রমণ করার জন্য মুসলিমের সামনে উপস্থিত হয় অথবা যদি মুসলিমের ভূমিতে অনুপ্রবেশ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।” (হাশিয়া আল – আদাউয়ি, আস-সায়িদী ২/২ এবং আশ-

শারহুস সগীর আকরাব আল-মাসালিক লিদ-দারদীর; ২/২৬৭)

শাফেয়ী মাজহাবের ইমাম বাজাওয়ারী (রঃ) এর মতেঃ

الجهاد أي القتال في سبيل الله

“আল জিহাদ অর্থ আল্লাহর পথে লড়াই করা”। (হাশিয়াত বাজাওয়ারী আলা শারহুন ইবনুল কাসিম, ২/২৬১)

ইবনে হাজার (রঃ) এর মতেঃ

وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار

“শরয়ী দৃষ্টিতে এর অর্থ হলো কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই এ ত্যাগ স্বীকারমূলক সংগ্রাম”। (ফাতহুল বারী ৬/৩)

হাম্বলী মাজহাবের সংজ্ঞা হচ্ছেঃ

قتال الكفار

“(জিহাদ হচ্ছে) কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা”। (মাতালিবু উলিন নাহি ২/৪৭৯)

الجهاد: القتال وبذل الوسع منه لإعلاء كلمة الله تعالى

“আল জিহাদ হচ্ছে আল ক্বিতাল এবং এই লড়াইয়ে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আইনকে সম্মুন্নত রাখা”।(উমদাতুল ফিকহ ১৬৬ পৃষ্টা ও মুনতাহাল ইরাদাত ১/৩০২)

ইমাম বুখারী (রঃ) ‘কিতাবুল জিহাদে’ শুধু কিতাল সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলোই উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও ‘জিহাদ অধ্যায়ে’ ঘোড়া, তরবারী, বর্ম, গণিমত, বন্দী, আক্রমণ ইত্যাদি কিতাল সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলোই উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে ফুকাহায়ে কিরামও ফিকহের কিতাব সমূহে জিহাদের আলোচনায় কিতাল সম্পর্কিত মাসায়েল উল্লেখ করেছেন।

এ আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ডঃ আসাদুল্লাহ আল গালিব সাহেব উল্লেখিত বইগুলোতে জিহাদ শব্দকে ইসলামী পরিভাষাগত (শরয়ী) অর্থে ব্যবহার করেন নি। বরং তিনি এ ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থে, কোথাও কোথাও নিজের আবিস্কৃত নতুন অর্থে ব্যবহার করেছেন!!

চতুর্থতঃ ‘এ যুগে জিহাদের সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার হলোঃ কথা, কলম, সংগঠন। আপনাকে অবশ্যই কথা বলা শিখতে হবে। ...’ এই কথা উনি কোথায় পেলেন? এ রকম কথা কোরআন, সুন্নাহ, সলফে সালেহীনদের উপলব্ধি কোথাও পাওয়া যায় না। এটা উনার ব্যক্তিগত এমন একটি কথা যার পক্ষে কোন দলীল নেই। তাই এই কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা বাতিল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

بعثت بين يدي الساعة بالسيف

আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য তরবারি (অসি) দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। একদিকে গালিব সাহেব দাবী করছেন, এখন আর অসির সময় নয়। অথচ দেখা যাচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরবারির নিচে এ যুগের তথাকথিত মুজতাহিদগণের মস্তিষ্ক প্রসূত অভিমত বধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরবারি দ্বারা দ্বীন বিরোধীদের মগজের খোপড়ী বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله

"যতক্ষণ না মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহের সাক্ষ্য না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে মানুষের সাথে কিতাল করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

আর এটা তো জানা কথা যে, সবাই 'লা ইলাহা ইল্লালাহ' গ্রহন করবে একেবারে কিয়ামতের পূর্বে, ঈসা (আঃ) এর আগমনের পর। অর্থাৎ সে সময় পর্যন্ত কিতাল চলবে। আর কিতাল যে অসি তথা অস্ত্র দিয়েই হয়, কলম দিয়ে হয় না, এটা এই দুনিয়ায় শিশুরাও বুঝবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ – أحمد ، ومسلم ، والنسائى ، و ابن حبان والبخارى ، والترمذى

অর্থাৎ, **ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রয়েছে তা হলো সওয়াব ও গনিমত।** কিন্তু ঘোড়া দ্বারা এই দুনিয়ার কোন যুদ্ধের ময়দানে লিখা হয়? ঘোড়া দ্বারা করা যায় কিতাল। তাহলে অসিযুদ্ধ এখনি নয় – কথাটির মাহাত্ম কি?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم

অর্থাৎ, **আমার উম্মতের মাঝে সর্বদা হক্কের উপর যুদ্ধরত একটি দল অব্যাহত থাকবে, তাদের বিরোধিতাকারীদের উপর তারা বিজয়ী থাকবে।**

বহু সংখ্যক হাদিসে এই তায়েফাতুল মনসুরাহ বা বিজয়ী দলের একটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে **ক্বিতাল** বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে যদি এখন অসির যুগ না

থাকে, তা হলে এই সত্যপন্থী দলটি কিভাবে ক্বিতাল করবে? ক্বিতাল তো কলম তথা মসি, যুক্তি-তর্ক কিংবা বক্তৃতা ইত্যাদি দিয়ে করা যায় না।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাব, আয়াতঃ ২১) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত **أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** কিন্তু যাদের ভাষ্যমতে বর্তমান যুগ মসির যুগ, তারা ভেবে দেখুন মসির যুগের যোদ্ধাদের জন্য এমন একজনকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন অনুসরণীয় নির্ধারণ করলেন যার জীবন কেটেছে অসির মাধ্যমে যুদ্ধের উপর। মসির যুদ্ধের মডেল হলেন অসির যোদ্ধা? কি উদ্ভট গবেষণা!

কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বেশী প্রভাব সৃষ্টিকারী কে হতে পারেন? তিনি ছিলেন**জাওয়ামিউল কালিম** এবং **أفصح العرب** এতদসত্ত্বেও রাসূলকে অসি ধরতে হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে বড় নেতা, উন্নত সংগঠক আর কে হতে পারবে? তারপরেও তাকে তরবারী হাতে নিতে হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় তেরো বছর অসিবিহীন চেষ্টা ও দাওয়াতী তৎপরতা চালিয়েছেন এত কিছু সত্ত্বেও ইকরামা ইবনে আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, হিন্দা ও মক্কার অন্যান্য সাধারণ অধিবাসীরা, যারা পরবর্তীতে আমাদের সময়ের যে কোন সংগঠক কিংবা দায়ীর হাতে ইসলাম গ্রহণকারীর চেয়ে বহুগুনে শ্রেষ্ঠ মুসলমান হয়েছিলেন, তারাও তখন ইসলাম গ্রহন করেননি।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

إِذَا جَاء نَصْرُاللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। (সূরা নছর, আয়াতঃ ১-২)

অর্থাৎ, বিজয় আসলে ইসলাম বিস্তৃত হবে, দলে দলে মানুষ ইসলামে আসবে।

আর বিজয় আসবে আল্লাহর সাহায্যে। আল্লাহর সাহায্য আসবে বান্দা যখন আল্লাহকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। (সূরা মুহাম্মদ, আয়াতঃ

৭)

আর আল্লাহ তায়ালাকে সাহায্য করা হয় লোহা দিয়ে। আল্লাহ বলেছেনঃ

وَ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ

আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। (সূরা হাদীদ, আয়াতঃ ২৫)

জিহাদের পদ্ধতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে আমল করে দেখিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তদানুসারে পথ চলেছেন। উম্মত জিহাদের একটি রূপ উপলব্ধি করে আসছে। যেমন 'ছালাত' যখন বলা হয় তখন একটি রূপ মানসপটে ভেসে ওঠে, এর মধ্যে কারো কোন সংশয় থাকে না। অর্থাৎ কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদাহ, তাহারাত এর মাধ্যমে যা আদায় করা হয় সেই ছালাতকেই সবাই বুঝেন। কেউ সালাত আদায় করেছে বলতে দুয়া করা বুঝায় না। অথচ দুয়া অর্থেও সালাত শব্দটির ব্যবহার হয়েছে।

'হাইয়া আ'লাস ছালাহ' শুনলে কেউ এটা বুঝেনা যে, মসজিদে গিয়ে দুরুদ শরীফ পড়ে আসলেই হবে। অথচ দুরুদ শরিফকেও কোরআনে ছালাত বলা হয়েছে (শাব্দিক অর্থে)। জিহাদের হলো তাই যা তীর, ধনুক, তরবারী, ঘোড়া, বর্ম এগুলোর মাধ্যমে সংগঠিত হয়। সময়ের ব্যবধানে এগুলোর ধরন পরিবর্তন হতে

পারে – যেমন বন্দুক, গুলি, বোমা, ড্রোন, ইত্যাদি তবে যুদ্ধ সর্বদা যুদ্ধই থাকবে – যুদ্ধ কখনো লিখনি কিংবা ভাষন হয়ে যাবে না। সে যুগেও লিখনি ছিল কিন্তু এটাকে কেউ যুদ্ধ বলেননি।

হ্যাঁ কিতালের প্রতি উৎসাহ প্রদান, বিরোধীদের দলিল খণ্ডন, কৌশল প্রণয়ন এগুলো যা কিতাল তথা যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট – এগুলোকেও ফুকাহায়ে কেরাম জিহাদ এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর মূলতঃ মুখ, কলম ইত্যাদির দ্বারা যে জিহাদ আছে, তা এটাই।

কিতাল তথা যুদ্ধ হল সশস্ত্র লড়াই, জিহাদ তার চেয়ে একটু ব্যাপক। অর্থাৎ জিহাদ হলো যুদ্ধ সংক্রান্ত যে কোন কর্মকাণ্ড, প্রস্তুতি, উৎসাহ প্রদান, হত্যা-চিন্তা, যুদ্ধের পরিকল্পণা প্রণয়ন ইত্যাদি। দ্বীন বিজয়ের নিয়্যতে যে কোন চেষ্টা – এটা পরিভাষায় জিহাদ নয়, শাব্দিক জিহাদ হতে পারে। আর শাব্দিক জিহাদ কখনো জিহাদের আহকাম, ফযিলত, প্রভাব, তাসির কিংবা ফল বহন করে না। যেমনঃ স্ত্রী সহবাস কে শাব্দিক অর্থে জিহাদ বলা হয়।

إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل

অর্থাৎ, যখন তোমাদের কেউ (স্ত্রীর) চার শাখা (হাত-পা) এর মাঝে বসে তারপর 'জিহাদ' করে, তার জন্য গোসল ওয়াজিব।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

(পিতা-মাতা) যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শরীক স্থির করতে 'জিহাদ' করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। (সূরা লোকমান, আয়াতঃ ১৫)

এখানে বলা হচ্ছে কাফের মাতাপিতা যদি তোমাদের শিরক করার জন্য চূড়ান্ত চাপ প্রয়োগ করে তাদের কথা শোন না। এখানে কাফেরের পক্ষ থেকে চাপ প্রয়োগকে জিহাদ শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এখন কি বলা হবে যে এ কাফের মাতা পিতা দ্বারা জিহাদ হয়েছে? তারা মুজাহিদ? জিহাদের ফযিলত তারা পাবে? এর দ্বারা দ্বীন বিজয়ী হবে?

ইহুদিদের স্বভাব পারিভাষিক অর্থ ও শাব্দিক অর্থের ব্যবধান না মানা। যেমনঃ

ابناء শব্দটি পারিভাষিক ভাবে 'প্রিয়' এর অর্থ বহন করে, ইহুদি-খ্রিস্টানরা এটাকে শাব্দিক অর্থ গ্রহন করে, তারা বলে যে আমরা আল্লাহ্*র সন্তান।

নাউজুবিল্লাহ! কি জঘন্য কাজ।

তারা পরিভাষাকে গুলিয়ে ফেলার কারনে **تحريف** করার কারণে শিরক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। যারা বসে বসে কলমের খোঁচায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রক্ত ঝরা দান্দান শহীদ হওয়া জিহাদকে গুরুত্বহীন করে দিচ্ছেন, তাদের রাসুলের বিরোধিতার কারণে কোন ফিতনায় পড়ে যাওয়া অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাবে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করা উচিত। হামযা (রাঃ) টুকরো টুকরো হয়েছেন যে জিহাদে, সাহাবায়ে কেরামের শতকরা আশি ভাগ যে জিহাদে শহীদ হয়েছেন, কোরআনের সাড়ে চারশত এর অধিক আয়াতের মধ্যে যে জিহাদের আলোচনা করা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতাশটির উপরে জিহাদি অভিযানে সৈন্য পরিচালনা করেছেন, অর্ধ শতকের উপরে জিহাদে সাহাবায়ে কেরামকে পাঠালেন – সে জিহাদ কারো কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে!! আবার কারো নিকট এটা জঙ্গিবাদ!! নাউজুবিল্লাহ! সার কথাঃ জিহাদ অর্থ কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ, জিহাদকে অস্বীকারকারী কাফির, অপব্যখ্যাকারী গুমরাহ, পরিত্যাগকারী ফাসেক। (ছরখছী)।

কিতালের মাধ্যমেই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে, ফিতনাহ তথা শিরক, শিরকের প্রভাব প্রতিপত্তি খতম হবে।

হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ কলম-সৈনিক তৈরী হয়ে গেলেও দ্বীন বিজয়ী হবে না, যতক্ষণ না দ্বীন বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ যে পথ দেখিয়েছেন সে পথ গ্রহন করা হবে। সে পথ কি? আল্লাহ পাকের স্পষ্ট ঘোষণাঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (সূরা আনফালঃ ৩৯)

ফিতনাহ শেষ হওয়া আর পরিপূর্ণ দ্বীন প্রতিষ্ঠা হওয়া নির্ভর করে কিতালের উপর। কিতাল কঠিন, অপছন্দনীয়, কষ্টকর। বিজ্ঞ হাকিম কি আমাদেরকে এমন কষ্টের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন আরও সহজে অসুখ নিরাময় হবার পথ বাদ দিয়ে? অথচ তিনি আরহামুর রাহিমীন। তাহলে এবার চিন্তা করুনঃ ফিতনা দূরীভূত হবার, দ্বীন প্রতিষ্ঠা হওয়ার আর কোন সহজ পদ্ধতি থাকতে পারে কি?

আমাদের ইয়াকিন হলো – না, আর নেই। থাকলে সেটা দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিতেন।

কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ্* রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ

বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। (সূরা বাকারাঃ ২১৭)

কাফেররা দ্বীন থেকে ফিরানোর জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহন করবে? – কিতাল।

এখন দ্বীন রক্ষায় কি করণীয়? কিতাল এর মুকাবেলায় কি রুমাল কিংবা কলম নিয়ে মুখোমুখি হওয়া? নাকি শত্রু যেভাবে আসবে তেমন ধরনের হাতিয়ার নিয়ে যাওয়া? হ্যাঁ, শত্রু কলমের আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক আক্রমণ, অর্থনৈতিক হামলা সব প্রয়োগ করছে কিন্তু এগুলো সবই সামরিক শক্তির অধীন। সামরিক বিজয় যার থাকবে এসব শক্তি তার পক্ষেই কাজ করবে। আজ কুফফারদের সামরিক বিজয় বিদ্যমান বিধায় এসব ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবী তাদের অনুসারী।

মানুষ তার রাজন্যবর্গের মতাদর্শ গ্রহণ করে থাকে। সুরায়ে নাসর এর বক্তব্যও এর সমর্থন করে। নতুবা পশ্চিমাদের সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা কি ইসলামের চেয়ে উন্নত যে কারণে মুসলমানরা পর্যন্ত তাদের আদর্শগুলো গ্রহণ করছে? এটা তাদের

সামরিক বিজয়ের প্রভাব। নতুবা লেখনীর / বক্তব্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিকট রয়েছে কিতাবুল্লাহ এর মতো মুজিযা। এর চেয়ে বড় লেখা / বক্তব্য পৃথিবীর সমুদয় লেখক-বক্তা কিয়ামত পর্যন্ত লিখে, বক্তৃতা দিয়ে এর ধারে কাছেও কি পৌঁছাতে পারবে? বাস্তবে লিখার ক্ষেত্রে আমাদের বিজয় বিদ্যমান।

এতদসত্বেও কোরআনের আদর্শ, বিধিবিধান, হুকুম-আহকাম কেন স্বয়ং মুসলিমরাই গ্রহণ করছে না? আপনি কোরআনের চেয়ে বেশি লিখে ফেলবেন? আরও উন্নত বক্তব্য দিয়ে ফেলবেন? পারবেন না। কিন্তু কোরআন মানা হচ্ছেনা কেন? সমাজে নামাজ নেই কেন, জাকাত নেই কেন, বরং সমাজে সুদ বিস্তৃত হচ্ছে কেন?

নামাজ ফরজ এটা মানুষ জানে না এ কারণে, নাকি এর দাওয়াত পৌঁছে নাই একারণে? নাকি রাফে ইয়াদাইনের ঝগড়ার নিস্পত্তি না হওয়ার কারনে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেনঃ

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ দান করলে তারা নামায কায়েম করবে,যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। (সূরা হজ্জ, আয়াতঃ ৪১)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইকামতে ছালাত হবে ক্ষমতা লাভ হলে। আল্লাহ বলছেন, মুমিনরা যদি ক্ষমতা পায় তখন ছালাতের প্রচলন করে আর আমাদের কেউ কেউ বলছে 'এর জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন নাই'। নাউজুবিল্লাহ!

ক্ষমতা আসলে কিভাবে কিতাব প্রতিষ্ঠিত হবে? আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি

নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (সূরা হাদীদ, আয়াতঃ ২৫)

দ্বীনের সাহায্য করার উপায় হলোঃ লোহা-অসি-অস্ত্র দিয়ে। মসিহ আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে দমন করবেন অসি হাতে নিয়েই।

আল্লাহ পাক নিজে কিতাল করেছেন। নবী অলিদের, ফিরিশতাদের দিয়ে কিতাল করিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ মিশনেই ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কে এ পথেই রেখে গেছেন। সাহাবায়ে কিরাম এ পথেই অর্থাৎ অস্ত্র-সরঞ্জাম সহ পৃথিবীর দিকে দিকে এগিয়ে গেছেন। বিজয় এনেছেন। উম্মতের একটি জামাতের কিতালের মাধ্যমে এ বসুন্ধরা ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়েছে। কুফর অপসারিত হয়েছে। ধীরে ধীরে আমরা সে পথ ছেড়ে আরামের পথ ধরে, এখন নানাবিধ ব্যারামে ভুগছি। যতক্ষণ সে পথ ফের না ধরবো, সেই ব্যারাম সারবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتم بالزرع، وتبعتم أذناب البقر، سلط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم

যখন তোমরা ঈনা (সন্দেহযুক্ত) কেনাকাটা শুরু করবে, গরুর লেজ ধরবে, ফসল ফলানো নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, আর জিহাদ ছেড়ে দিবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর অপমান চাপিয়ে দেবেন তা সরাবেন না যতক্ষণ তোমরা দ্বীনের দিকে ফিরে না আসবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস সহীহ)

এখানে দ্বীনের দিকে ফেরত আসা বলতে হাদিসের ইমামগণ জিহাদ বুঝেছেন।

সুতরাং, **অসিযুদ্ধ এখনই নয়, এখন মসি যুদ্ধের সময়** – এসব কথা নফসের খায়েশাত ছাড়া আর কিছু নয়। এসব কথার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। অনুরুপভাবে, **'তাওহীদ বিরোধী আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনই হলো সবচেয়ে বড় জিহাদ'** – আক্বীদা ও আমলের সংশোধনকে জিহাদ বলা হয়েছে, এমন কোন দলীল আমরা ইসলামে পাই না। হাদিস কিংবা ফিকহের কোন ইমামও

এ রকম কোন কথা বলেন নি। যদি আক্বীদার সংশোধন জিহাদ হয়, তবে দাওয়াহ ইলাল্লাহ কি? তবে তালিম-তারবিয়া কি? আমরে বিল মারুফ-নাহি আনিল মুনকার কি?

তাই আমাদেরকে সর্বদা যথাযথ শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

অনুরুপভাবে, **'তবে জিহাদের পদ্ধতি পরিবর্তনশীল। অসিযুদ্ধ এখনই নয়। মসীযুদ্ধ অসির চাইতে মারাত্বক'** – এই কথার পক্ষেও কোন দলীল-প্রমাণ নেই। এটা ইসলামের কোন কথা নয়। বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي

নিশ্চয়ই নিক্ষেপের মধ্যে আছে শক্তি, নিশ্চয়ই নিক্ষেপের মধ্যে আছে শক্তি, নিশ্চয়ই নিক্ষেপের মধ্যে আছে শক্তি। (সহীহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, সুনান ইবনে মাজাহ, সুনান তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

দেখা যাচ্ছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিক্ষেপের তথা তীর, অসি, বন্দুক ইত্যাদির মধ্যে আছে শক্তি। কিন্তু এরকম সুস্পষ্ট হাদিস থাকার পরও কিভাবে আমরা **'মসীযুদ্ধ অসির চাইতে মারাত্বক'** – এই ধরনের কথা বলতে পারি। বরং আল্লাহ আমাদেরকে জিহাদের প্রস্তুতির জন্য ঘোড়া ও শক্তি সঞ্চয় করতে বলেছেন।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

"আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সামর্থ অনুযায়ী সংগ্রহ করো শক্তি-সামর্থ্য ও পালিত ঘোড়া ..."(সূরা আল আনফাল, আয়াতঃ ৬০)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিহাদের জন্য মুসলমানদেরকে বড় বড় লেখক, সাংবাদিক হতে বলেন নি। কলমের ব্যবহারকে বেশী শক্তিশালী বলেন নি। বরং

শক্তি ও ঘোড়া জোগাড় করতে বলেছেন। সুতরাং ডঃ আসাদুল্লাহ গালিব সাহেবের জিহাদ সম্পর্কে এই ধারনাগুলো আল-কোরআন ও হাদিসের পরিপন্থী।

আমরা কলমের গুরুত্বকে অস্বীকার করছি না, মিডিয়ার গুরুত্বকে অস্বীকার করছি না, মানুষের মন-মানষিকতা পরিবর্তনে লেখনীর গুরুত্বকে অস্বীকার করছি না। কিন্তু শরীয়াতে প্রত্যেক বিষয়ের একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। সেটাকে তার চাইতে বেশী আগে বাড়িয়ে দিলে, সমস্যা দেখা দেয়। বরং প্রত্যেকটা বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন, ততটুকু দেয়াই উচিত।

বরং আল্লাহ বলছেন, কাফিররা চায়, আমরা যেন আমাদের অস্ত্র সম্পর্কে বেখবর হয়ে যাই, আর শুধু মসী-কলম ইত্যাদি নিয়ে পড়ে থাকি, যাতে তারা আমাদের উপর সহজে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম উম্মাহ এখন এই অবস্থার সম্মুখীন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً

কাফেররা চায় তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং সরঞ্জামাদি থেকে গাফিল হও যাতে তারা তোমাদেরকে একযোগে আক্রমন করতে পারে। (সূরা আন নিসা, আয়াতঃ ১০২)

পঞ্চমতঃ এই সাইটে এক মন্তব্যকারী মন্তব্য করেছেন, **"এটি আসাদুল্লাহ আল গালিব এর একটি ইজতিহাদ"**। এই ব্যাপারে আমাদের কথা হলোঃ ইজতিহাদ হয় আল-কোরআন ও হাদিসের আলোকে একটি নতুন সমস্যার সমাধান দেবার সময়। কিন্তু 'আল-জিহাদের অর্থ কিংবা সংজ্ঞা' তো আজ চৌদ্দশত বছর পর নতুনভাবে দেয়া হচ্ছে না, কিংবা এটা নতুন কোন বিষয়ও নয় যে এর উপর কেউ এখন ইজতিহাদ করবে। বরং যুগে যুগে আলিমরা এই ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কথা বলে গেছেন। তাই জিহাদ কাকে বলে, এর অর্থ কি – এসব ব্যাপারে কোন ইজতিহাদের স্থান নেই। তাই মন্তব্যকারীর এই মন্তব্য গ্রহনযোগ্য নয়।

আর কলমের মাধ্যমে জিহাদের ব্যাপারটা ইমাম কাসানী (রঃ) এর সংজ্ঞায় এসে গেছে। তিনি বলেছেনঃ**"শরীয়াতের পরিভাষায় (জিহাদ হলো) নিজের জীবন, সম্পদ, মুখ ও অন্যান্য যা কিছু দিয়ে সম্ভব তার মাধ্যমে আল্লাহর পথে লড়াই করার**

জন্য শক্তি ও ক্ষমতা উৎসর্গ করা"। তাই মুখ, কলম ইত্যাদি দিয়ে জিহাদে শরীক হওয়া যাবে তবে সেটা হতে হবে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর (সম্মুখ যুদ্ধের) সমর্থনে। কিন্তু ক্বিতালের সাথে সম্পর্কহীন কলমের মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত দাওয়াহ, তারবীয়া-তাসফিয়া, আমরে বিল মারুফ-নাহি আনিল মুনকারের অংশ হতে পারে কিন্তু জিহাদের অংশ হবে না।

পরিশেষে আমরা বলতে চাইঃ ডঃ আসাদুলাহ গালিব সাহেবের উপরুক্ত কথাগুলো যথার্থ নয়, এসব কথার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। বরং এই কথাগুলো সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদিসের বিরোধী। এগুলো তার একান্ত নিজস্ব কিছু মত যার পক্ষে আল-কোরআন, হাদিস কিংবা সলফে সালেহীনদের কোন বক্তব্য নেই। উল্লেখ্য, এই বইসমূহে আরো কিছু বিষয় ছিলো যা আমাদের দৃষ্টিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অগ্রণযোগ্য মনে হয়েছে, কিন্তু আমরা শুধুমাত্র এই প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত বিষয় নিয়েই আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামী শরীয়াতের আলোকে জিহাদকে বুঝার ও জিহাদে সামিল হবার তৌফিক দান করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

যে ব্যক্তি নিজে গাযওয়াতে (যুদ্ধের জন্য বের হওয়া) যায়নি কিংবা গাযওয়াতে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেনি, সে নিফাকের একটি শাখার উপর মৃত্যু বরণ করলো। (সহীহ মুসলিম)

আল্লাম সিন্দী (রঃ) সুনান নাসায়ীর হাশিয়াতে বলেন, **'এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, সে জিহাদের যাবার নিয়্যত করে নি। আর জিহাদে যাবার নিয়্যত থাকার প্রমাণ হলোঃ প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আল্লাহ বলেছেনঃ**

وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً

আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। (সূরা আত তাওবা, আয়াতঃ ৪৬)'

আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে নিফাকের শাখায় মৃত্যু হতে হিফাজত করেন।

কমেন্ট

shamer pothik

Senior Member

১০-২২-২০১৬

ইহুদিদের স্বভাব পারিভাষিক অর্থ ও শাব্দিক অর্থের ব্যবধান না মানা। যেমনঃ

ابناء। শব্দটি পারিভাষিক ভাবে 'প্রিয়' এর অর্থ বহন করে, ইহুদি-খ্রিস্টানরা এটাকে শাব্দিক অর্থে গ্রহন করে, তারা বলে যে আমরা আল্লাহর সন্তান।

নাউজুবিল্লাহ! কি জঘন্য কাজ।

তারা পরিভাষাকে গুলিয়ে ফেলার কারনে تحريف করার কারণে শিরক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

যারা বসে বসে কলমের খোঁচায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রক্ত ঝরা দান্দান শহীদ হওয়া জিহাদকে গুরুত্বহীন করে দিচ্ছেন, তাদের রাসুলের বিরোধিতার কারণে কোন ফিতনায় পড়ে যাওয়া অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাবে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করা উচিত।

হামযা (রাঃ) টুকরো টুকরো হয়েছেন যে জিহাদে, সাহাবায়ে কেরামের শতকরা আশি ভাগ যে জিহাদে শহীদ হয়েছেন, কোরআনের সাড়ে চারশত এর অধিক আয়াতের মধ্যে যে জিহাদের আলোচনা করা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতাশটির উপরে জিহাদি অভিযানে সৈন্য পরিচালনা করেছেন, অর্ধ শতকের উপরে জিহাদে সাহাবায়ে কেরামকে পাঠালেন – সে জিহাদ কারো কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে!! আবার কারো নিকট এটা জঙ্গিবাদ!! নাউজুবিল্লাহ!

সার কথাঃ জিহাদ অর্থ কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ, জিহাদকে অস্বীকারকারী কাফির, অপব্যখ্যাকারী গুমরাহ, পরিত্যাগকারী ফাসেক। (ছরখছী)।

কিতালের মাধ্যমেই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে, ফিতনাহ তথা শিরক, শিরকের প্রভাব প্রতিপত্তি খতম হবে। হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ কলম-সৈনিক তৈরী হয়ে গেলেও দ্বীন বিজয়ী হবে না, যতক্ষণ না দ্বীন বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ যে পথ দেখিয়েছেন সে পথ গ্রহন করা হবে।

সে পথ কি?

আল্লাহ পাকের স্পষ্ট ঘোষণাঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (সূরা আনফালঃ ৩৯)

ماشاءالله

ভাই আল্লাহ আপনাকে জাজায়ে খায়র দান করুন

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫২০৪

দারুল হারবের বেসামরিক নাগরিক হত্যার শারয়ী বিধান

একটি ফ্বিকহ ভিত্তিক পর্যালোচনা

আবু মুহারিব

Junior Member

১০-১৭-২০১৬

৯/১১ থেকেই সারা বিশ্বব্যাপী আর বাংলাদেশে গুলশান অভিযানের পর থেকে সাধারন মুসলিম ও উলামাদের পক্ষ থেকে মুযাহিদিনদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উত্থাপণ করা হচ্ছে যে, জিহাদি জামাতগুলো কাফিরদের সাধারন ও বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করে যা ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী সম্পূর্ণ হারাম। তখন মুযাহিদিনদের পক্ষ থেকে সাধারনত উত্তর দেওয়া হয়, “

তোমরা কি দেখছ না কুফফাররা কিভাবে আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মির, চেচনিয়াতে লক্ষ লক্ষ নীরিহ মুসলিম হত্যা করছে? আমরা তার বিপরীতে সামান্য জবাবই দিয়েছি মাত্র!”

তখন ওই সমস্ত মুসলিমদের পক্ষ থেকে সাধারণত জবাব দেওয়া হয়,

“হ্যা, কুফফাররা মুসলিমদের হত্যা করছে এটা ঠিক। এজন্য আমাদের কষ্টে বুক ভেঙ্গে যায়, দুঃখে কষ্টে চোখে পানি চলে আসে, রক্তে আগুন ধরে যায় কিন্তু তাই বলে কি আমরাও তাদের মত নিষ্ঠুর, অমানবিক হতে পারি? তারা তো কাফের, তাই তারা যা খুশি করতে পারে কিন্তু আমাদের তো শরীয়াহ এর বিধি বিধান মেনে চলতে হয়। আমরা যদি শরীয়াহ’র বিধি বিধান না মেনে জিহাদ করতে যেয়ে নিহত হয় তবে তো জাহান্নামে যাব। তাই তারা আমাদের কোটি কোটি নীরিহ মানুষ হত্যা করলেও বিনিময়ে আমরা শুধু তাদের কয়েক লক্ষ সামরিক বাহীনির সদস্যদেরই হত্যা করতে পারব। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু তা’য়ালা বলেছেন, একজনের পাপের

দায় আরেকজন বহন করবে না। আমরা যদি তাদের সামরিক সদস্যদের হত্যা করতে সমর্থ না হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের আল্লাহ'র কাছে বেশী বেশী দোয়া করতে হবে যেন আল্লাহ ঐ সব জালিমদের ধ্বংস করে দেন। আর আমাদের লক্ষ লক্ষ নিহত মুসলিমদের জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেন, যারা বেচে আছেন তাদেরকে সবর করা তৌফিক দেন। কিন্তু কখনই আমাদের নিরীহ মানুষ হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তাদের একজন নীরিহ মানুষকেও হত্যা করা যাবে না। কারণ আল্লাহ বলেছেন যে একজন মানুষ হত্যা করল সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করল।"

ইসলাম দারুল হারবের (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত দেশ) অধিবাসীদের সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকে বিভক্ত করেছে এবং বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু ইসলাম প্রদত্ত বেসামরিক নাগরিকের সংজ্ঞা আর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রদত্ত বেসামরিক নাগরিকের সংজ্ঞার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তদুপরি এবিষয়ে ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রেও রয়েছে যথেষ্ট ইখতিলাফ (মতবিরোধ)। আমরা সবাই জানি ফিক্বহি বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে গড়ে উঠেছে চার মাযহাব। আবার ফুক্বাহাদের কেউ কেউ একক কোন মাযহাব অনুসরণ না করে সরাসরি হাদীস থেকে মাসায়ালা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে যারা সরাসরি হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেন তারা নিজেদের আহলে হাদীস বা সালাফী পরিচয় দেন। একক মাযহাব থেকে সকল মাসায়ালা গ্রহণের কিছু জটিলতা রয়েছে আবার সরাসরি হাদীস থেকে দলীল নেওয়ার মধ্যেও কিছু জটিলতা রয়েছে। মূলত মাযহাবের সীমাবদ্ধতা দূর করতেই সরাসরি হাদীস থেকে দলীল নেওয়ার প্রবণতা শুরু হয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সরাসরি হাদীস অনুসরণ মাযহাব অনুসরণের জটিলতা কমায় নি, বরং আরো বৃদ্ধি করেছে। তবে অনেকেই আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবেন, তাদের মতে মাযহাব অনুসরণের চেয়ে সরাসরি হাদীস অনুসরণ করা অধিকতর সহীহ পন্থা। আমি মাযহাব ও লা-মাযহাব বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে আগ্রহী নয়, কারণ এ বিতর্কের কোন পরিসমাপ্তি নেই। আর বিতর্কে জয়ী হওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং একটা গ্রহণযোগ্য উপসংহারে পৌছান আমার উদ্দেশ্য যেন কেউ জিহাদের নামে নিরীহ কাফির হত্যা না করে। আবার সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী একজন মুযাহিদকে যেন কেউ জঙ্গী, সন্ত্রাসী, বিপথগামী বলে অপবাদ না দেয়।

যারা মাযহাব অনুসরণ করেন তাদের সরাসরি হাদীস থেকে দলীল দিয়ে কোন ফায়দা নেই, তেমনি যারা 'আহলে হাদীস' তাদেরকে মাযহাবের কিতাব থেকে দলীল দিয়েও কোন ফায়দা নেই। বর্তমানে বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক, কওমী মাদ্রাসা বা হেফাযতে ইসলাম, জামাতে ইসলামী এবং আহলে হাদীস বা সালাফি আন্দোলন। কওমী মাদ্রাসা এবং তাবলীগ জামাতের ভাইয়েরা হানাফী মাযহাব অনুসরণ করেন আর জামাতে ইসলামী ও আহলে হাদিসের ভাইয়েরা সুনির্দিষ্ট কোন মাযহাব অনুসরণ করেন না। তারা সহিহ হাদীস ও কোরআন থেকে সরাসরি দলীল গ্রহণ করেন। কওমী মাদ্রাসা ও তাদের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে আমি হানাফী মাযহাব থেকে সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকের সংজ্ঞা দিব, অতঃপর জামাতে ইসলামী ও আহলে হাদীস ভাইদের উদ্দেশ্যে হাদীস ও কোরআন থেকে দলীল দিব ইনশাল্লাহ। অতিরিক্ত হিসাবে জামাতে ইসলামীর ভাইদের জন্য মাওলানা মওদূদী রহিমাহুল্লাহ থেকেও কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হবে।

হানাফী মাযহাব থেকে দলীল

কওমী মাদ্রসার ছাত্র শিক্ষক সকলেরই জানা আছে যে ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ নিজে হানাফী মাযহাবের কোন কিতাব রচনা করে যান নি। ইমাম আবু হানিফা রহঃ মৌখিকভাবে যেসব মাসআলা শিক্ষা দিতেন উনার ছাত্রদের মাধ্যমে সেগুলোই পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে হানাফী মাযহাবের যতগুলো প্রামাণ্য গ্রন্থ রয়েছে তার সবগুলো ইমাম আবু হানিফার মৃত্যুর অনেক পরে রচিত। কওমী মাদ্রসায় দাওরায়ে হাদীস সিলেবাসে হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে ‘আল হিদায়া’ পাঠ করা হয়। উচ্চতর সিলেবাসে ‘বাদাউস সানায়ে’, ‘ফাতহুল কাদীর’, ‘ফতোয়া এ আলমগীরি’, ‘আল মাবসুত’, ‘ফতয়ায়ে শামী’ কিতাবগুলো পাঠ করা হয়। কওমী মাদ্রাসা ফারেগ সকল ছাত্র শিক্ষক জানেন যে, এই কিতাবগুলো লেখকের নিজের কোন রচনা বা ফতোয়া সমগ্র নয়, বরং এ কিতাবগুলোতে সংকলক ইমাম আবু হানিফা রহঃ ও তার ছাত্রদের দেওয়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফতোয়া গুলো সংগ্রহ করে কিতাব আকারে প্রকাশ করেছেন মাত্র। তাই এই কিতাব সমূহে যে রায় দেওয়া হয়েছে তাকেই হানাফী মাযহাবের স্বীকৃত রায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। হানাফী মাযহাবের এক কিতাবের ফতোয়ার সঙ্গে আরেক কিতাবের ফতোয়ার খুব বেশী ইখতিলাফ নেই। যেমন নিচে হানাফী

মাযহাবের দুইটি কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এবং উভয় কিতাবের ইবারতের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

কওমী মাদ্রাসার দাওরাহ হাদীসের সিলেবাসভুক্ত কিতাব 'আল হিদায়া' থেকে আমরা প্রথমে সামরিক ও বেসামরিক লোকের সংজ্ঞা দেখব ইনশাল্লাহ। উক্ত কিতাবটি আবু তাহের মেসবাহ সাহেব অনুবাদ করেছেন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেসন প্রকাশ করেছে। তাই বাংলা ভাষাভাষী যে কেউ চাইলে মূল কিতাবটি পড়ে দেখতে পারেন। ডাউনলোড লিঙ্কঃ

http://www.islameralobd.com/২০১৪/১০/Al-Hidaya.html আমি এখানে 'আল হিদায়া' কিতাব থেকে কিতাল সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণটাই হুবুহু তুলে ধরা হল। লাল রঙয় ডাবল কোটেশনের মধ্যে কিতাবের ইবারত আর ব্র্যাকেটে কালো রঙয়ে আমার ব্যাখ্যা।

কিতাবঃ আল হিদায়া

সংকলনেঃ বুরহান উদ্দিন আলি ইবনে আবু বকর আল মারগিনানী রহিমাহুল্লাহ
অনুচ্ছেদঃ 'জিহাদ ও লড়ায়ের পদ্ধতি'

২য় খণ্ড ৪৩০ পৃষ্ঠা

"মুসলিম বাহিনী যখন দারুল হারবে প্রবেশ করে কোন শহর বা দুর্গ অবরোধ করবে তখন তাদের ইসলামের প্রতি দাওয়াহ দিবে। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রতি দাওয়াহ না দিয়ে কোন কওমের বিরুদ্ধে লড়াই করেন নি। যদি তারা দাওয়াতে সাড়া দেই তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত থাকবে। কেননা উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ না করা পর্যন্ত লড়াই করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি।' আর যদি তারা সাড়া দানে বিরত থাকে তাহলে তাদেরকে জিযিয়া প্রদানে আহ্বান জানাবে। প্রেরিত বিভিন্ন বাহিনীর অধিনায়কদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই আদেশ করেছেন। আর তাছাড়া আয়াতের ভাষ্য অনুসারে জিজিয়া হচ্ছে লড়াই থেকে বিরত থাকার পন্থা সমূহের অন্যতম।

এটা হল তাদের বেলায়, যাদের থেকে জিজিয়া গ্রহণের বিধান রয়েছে। পক্ষান্তরে মোরতাদ ও আরব মূর্তি পূজারক যাদের থেকে জিজিয়া গ্রহণের বিধান নেই, তাদের থেকে জিজিয়া গ্রহণের আহ্বান জানানোর মধ্যে কোন ফায়দা নেই। কেননা তাদের থেকে তো ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ বলেছেন "ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর" যদি তারা জিজিয়া দিতে সম্মত হয় তাহলে মুসলমানদের উপর যাবতীয় সুবিধা তাদের জন্য হবে এবং মুসলমানদের উপর আরোপিত যাবতীয় দায় তাদের উপর হবে।

কেননা, হযরত আলী রাঃ বলেছেন যে, তারা জিজিয়া এজন্যই ব্যয় করেছে যে তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতই (নিরাপদ) হয়ে যায় এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতই (নিরাপদ) হয়ে যায়।

মতনে যে 'বদল' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরআনে যে এ'ত শব্দের উল্লেখ রয়েছে, এ উভয়টির দ্বারা 'জিজিয়া প্রদান' গ্রহণ করা উদ্দেশ্য। আল্লহই অধিক সমগত। যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছে নি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ছাড়াই লড়াই শুরু করা জায়েজ নেই। কেননা বিভিন্ন বাহীনির অধিনায়কদের উপদেশ প্রদানকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন্, তখন আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এ সাক্ষ্য প্রদানের দাওয়াত দাও।

তাছাড়া ইসলামের দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমেই তারা জানতে পারবে যে, দীনের বিষয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, সম্পদ লুণ্ঠন ও পরিবার পরিজনকে দাস বানানোর উদ্দেশ্যে নয়। তাতে হয়ত তারা দাওয়াতে সাড়া দিবে। আর আমরাও লড়াইয়ের পরিশ্রম থেকে বেচে যাব। যদি দাওয়াতের পুর্বেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে তবে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে গোনাহগার হবে। তবে কোন ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা প্রাণ রক্ষা কারী এখানে অনুপস্থিত, আর তা হল দীন গ্রহণ কিংবা দারুল ইসলামে আশ্রয় গ্রহণ। সুতরাং অমুসলিম নারী বা শিশুদের হত্যার মত হল।"

(কোন আমান বা নিরাপত্তা চুক্তি না থাকলে অমুসলিম নারী ও শিশুদের ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করলে হত্যাকারী গোনাহগার হবেন, তবে এ জন্য তাকে রক্তপণ বা কাফফারা দিতে হবে না। শুধু তওবাহ ইস্তিগফারই যথেষ্ট। এরকম দাওয়াত ছাড়াই যুদ্ধ শুরু করলে গোনাহগার হবেন কিন্তু দিয়ত বা কাফফারা ওয়াজিব হবে না।)

"আর যাদের কাছে ইতিপূর্বে দাওয়াত পৌছেছে, তাদেরও দাওয়াত দেওয়া মুস্তাহাব। অতিরিক্ত সতর্কীকরণ হিসাবে; তবে তা ওয়াজিব নয়। কেননা বিশুদ্ধ বর্ননায় প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অসতর্ক অবস্থায় বনী মুস্তালিকের উপর হামলা করেছিলেন এবং উসামা (রাঃ) কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন উবনা বস্তিতে খুব জোরে হামলা চালানোর এবং বস্তি জ্বালীয়ে দেয়ার। আর অসতর্ক হানা দাওয়াত দিয়ে হয় না।"

(আক্রমণাত্মক যুদ্ধের সময় দাওয়াত বা জিজিয়া দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এখানে। কাফেররা যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয় তবে দাওয়াত বা জিজিয়া কোনটাই চাওয়ার আর অবকাশ থাকে না। বর্তমানে আমেরিকা, ইউরোপ মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করছে তাই তাদের দাওয়াত দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।)

"ইমাম কুদুরী বলেন, যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য প্রর্থণা করবে এবং লড়াইয়ে অবতীর্ন হবে। কেননা সোলায়মান বিন বুরায়দা (রাঃ) সম্পর্কিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তারা দাওয়াত অস্বীকার করে তবে তাদেরকে জিজিয়া প্রদানের আহ্বান জানাও। এরপর তিনি বলেছেন, যদি তারা তা প্রত্যাখ্যান করে তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য প্রর্থণা কর এবং লড়াইয়ে অবতীর্ণ হও।

আর যেহেতু আল্লাহই তার প্রিয় বান্দাদের সাহায্যকারী এবং তার শত্রুদের ধবংশকারী। সুতরাং সকল বিষয়ে তারই সাহায্য প্রর্থণা করা কর্তব্য। আর তাদের বিরুদ্ধে মিনজানিক (কামান) মোতায়েন করবে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তায়েফের বিরুদ্ধে করেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জ্বালাও পোড়াও চালাবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বোরায়রা অঞ্চল জ্বালিয়ে (প্রয়োজনে) দিয়েছিলেন।"

(মিনজানিক হচ্ছে এক ধরনের কামান বা গুলতি যা থেকে আগুনের গোলা বা পাথর ছোরা হয়। তায়েফের সীমানা প্রাচীর থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কামানের অগ্নি গোলা নিক্ষেপ করেছিলেন। এই গোলা সামরিক বেসামরিক সকল নাগরিকের উপর পতিত হত। ইচ্ছাকৃত ভাবে কাফিরদের বেসামরিক নাগরিক হত্যা করা জায়েজ নেই। কিন্তু এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা

জায়েজ যেখানে সামরিক বেসামরিক পৃথক করা যায় না অর্থাৎ যে কেউ নিহত হতে পারে। ফিলিস্তিনের হামাস ইসরায়েলে ভূমি লক্ষ করে গাযা থেকে রকেট ছুরে মারে যেটা সামরিক বেসামরিক যেকারো উপর পতিত হতে পারে। এই পদ্ধতি জায়েজ। একইভাবে কাফিরদের পাবলিক প্লেস (জনবহুল স্থান) যেমন মেট্রো রেল, বাস ষ্টেশন, বিমান বন্দর, শপিং মল ইত্যাদি জায়গায় আক্রমণ করলে সামরিক বেসামরিক উভয় শ্রেণির মানুষ নিহত হতে পারে। দারুল হারবের বাচ্চাদের স্কুলে আক্রমণ করা আর রেল স্টেশনে আক্রমণ করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বাচ্চাদের স্কুলে বাচ্চা থাকে এটা সবার জানা আছে। তাই সেখানে আক্রমণ করা নাজায়েজ। একইভাবে বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা কলেজ, বৃদ্ধাশ্রম, পঙ্গু হাস্পাতাল ইত্যাদি স্থানে হামলা করা জায়েজ হবে না। বাস স্টেশনে হামলা হলেও কিছু বাচ্চা মারা যেতে পারে কিন্তু সেটা হামাসের রকেট ছোরার মতই। শত শত রকেট ইসরাইলের শহরে পতিত হলে সেগুলো যে কিছু বেসামরিক নাগরিক হত্যা করবে সেটা নিশ্চিত। পরিসংখ্যান ঘাটলেও দেখা যায় হামাসের রকেট হামলায় অনেক ইসরাইলি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। ঠিক তেমনি বিমান বন্দরে হামলা করলে কিছু বেসামরিক নাগরিক নিহত হবে তাই বলে সে হামলা থেকে বিরত থাকার কোন দরকার নেই। অনেকের ধারণা বিমান বন্দরে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ সদস্য যারা থাকে তারাও তো নীরিহ! যুদ্ধ সক্ষম সকল পুরুষ সামরিক লোক বিবেচিত হবে যা আমরা এই অনুচ্ছেদের পরবর্তী অংশে দেখতে পাব। বেসামরিক বলতে নারী, শিশু, অন্ধ, পঙ্গু এরকম কতক লোককে বুঝান হচ্ছে। বিমান বন্দরে এরকম অল্প কিছু বেসামরিক নাগরিক থাকবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু তারা নিহত হলেও সেখানে হামলা করা যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সাল্লামের সময় নিক্ষিপ্ত কামানের গোলায় বা হামাসের নিক্ষিপ্ত রকেটে যেমন সামরিক বেসামরিক সবাই নিহত হয়, তেমনি বিমান বন্দরে, বাস স্টেশনে হামলা করলেও সামরিক বেসামরিক সবাই নিহত হয়। তাই এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং উভয় পদ্ধতি জায়েজ। বেলজিয়ামের বিমানবন্দরে আইএসের হামলা, আল কায়দার লন্ডন মেট্রো রেলে হামলা, স্পেনের মাদ্রিদে ট্রেন স্টেশনে হামলা তাই হানাফী মাযহাবের মাসআলা অনুসারে জায়েজ।)

"ইমাম কুদুরি রহ; বলেন, (বাধ ভেঙ্গে বা অন্য উপায়ে) তাদের উপর পানি ছেড়ে দেবে এবং তাদের বৃক্ষ নিধন করবে এবং তাদের ফসল নষ্ট করবে।"

(এখানে খেয়াল করুন দারুল হারবে পানি ছেড়ে তার অধিবাসীদের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া যাবে। পানি ছেড়ে দিলে সামরিক ও বেসামরিক উভয় নাগরিক নিহত হবে। একই ভাবে বৃক্ষ নিধন করে, ফসল নষ্ট করে তাদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া যাবে। আর খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিলে সামরিক বেসামরিক সকল লোকই নিহত হবে। খাদ্য পানীয় বন্ধ করে দিয়ে যদি দারুল হারবে আক্রমণ করা বৈধ হয়, তবে ট্রাক চাপা দিয়ে তাদের হত্যা করা বৈধ হবে না কেন? একইভাবে দারুল হারবে জীবাণু অস্ত্র বা রাসায়নিক অস্ত্র দিয়েও হামলা করা যাবে। কারণ বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া, খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার সঙ্গে এই পদ্ধতির তেমন কোন পার্থক্য নেই। বর্তমানে কাফির গোষ্ঠী রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। সলফে সালেহীনদের বাদ দিয়ে নিশ্চয় মুসলিম মুযাহিদিনরা জেনেভা সনদ থেকে মাসআলা গ্রহণ করবে না। তাই মুযাহিদিনরা যদি আমেরিকা বা ইউরোপে জীবাণু অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে তবে সেটা হালাল হবে উক্ত মাসআলা অনুসারে।)

"কেননা এসব দ্বারা তাদের লাঞ্ছিত করা হয়, তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করা হয়, তাদের প্রতিপত্তি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং তাদের সংহতি বিচ্ছিন্ন করা হয়। সুতরাং তা বৈধ হবে।"

কাফির দেশের কোন জনবহুল এলাকা (পাবলিক প্লেসে) বা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় যখন হামলা করা হয় তখন তাদের মধ্যে লাঞ্ছনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যেমনটা নাইন এলেভেনের পরে তাদের মধ্যে হয়েছিল। আমেরিকা নিজের সামরিক ও প্রযুক্তিগত শক্তি নিয়ে বড়াই করত। এই হামলার ফলে তাদের সে "প্রতিপত্তি" কি ভেঙ্গে যায় নি? হ্যা, তারা তাদের সে প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আফগানিস্থানকে জ্বালিয়ে পুরিয়ে দিয়েছে কিন্তু এখন সেখানে তাদের প্রতিপত্তি চূড়ান্তভাবে ভেঙ্গে যাচ্ছে। অনেকের ধারণা এসব হামলা করে তো আর কাফিরদের পরাজিত করা যায় না, তাই এরকম হামলা করার মধ্যে উম্মাহ'র জন্য কোন খায়ের নেই। কিন্তু আমরা মাযহাবের কিতাবে দেখতে পাচ্ছি চূড়ান্ত বিজয় না হলেও কাফিররা যে লাঞ্ছিত হয় এটাই একটা বিজয় এবং এই উদ্দেশ্যে সেখানে হামলা করা যাবে।)

"তাদের মাঝে মুসলিম বন্দী বা ব্যবসায়ী থাকলেও তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে বাধা নেই। কেননা তীর বর্ষণে ইসলামের কেন্দ্র থেকে প্রতিরোধের মাধ্যমে বৃহৎ ক্ষতিরোধ করা হয়। পক্ষান্তরে মুসলিম বন্দী ও ব্যবসায়ী নিহত হওয়ায় সীমিত ক্ষতি। তাছাড়া খুব কম দুর্গই কিছু সংখ্যক মুসলিম থেকে খালি হয়। সুতরাং তা বিবেচনা করে যদি বিরত থাকতে হয় তবে জিহাদের দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে।"

(আমেরিকার নাইন ইলেভেন বা ফ্রান্সের নিস শহরে হামলায় বেশ কিছু মুসলিম নিহত হওয়ায় যারা আপত্তি তুলেছেন তাদের এ মাসআলা দ্রষ্টব্য। তবে মুসলিমদের যদি পৃথক করা যায় তবে অবশ্যই তা করতে হবে। কিন্তু যখন পৃথক করা যায় না তখন মুসলিমদের কথা বিবেচনা করে হামলা থেকে বিরত থাকা যাবে না।)

"যদি তারা মুসলিম বালকদের কিংবা বন্দিদের ঢাল রূপে ব্যবহার করে তবে (আমাদের বর্ণিত কারণে) তাদের প্রতি তীর বর্ষণ থেকে বিরত থাকবে না। অবশ্য কাফিরদের প্রতি তীর বর্ষণের নিয়ত করবে। কেনন কার্যতঃ পার্থক্য করা অসম্ভব হলেও উদ্দেশ্যগত ভাবে তা সম্ভব। আর আদেশ পালনের দায়িত্ব সাধ্য অনযায়ী। আর ওই মুসলমানদের যে কজন তাদের তীর বর্ষণের শিকার হবে তাদের দিয়ত মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হবে না। আর কাফফারাও ওয়াজিব হবে না।

(কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি মুসলিম নিহত হলে কোন কাফফারা বা রক্তপণ ওয়াজিব হবে না, সুতরাং নাইন ইলেভেন বা ফ্রান্সের নিস শহরে আক্রমণে যে সমস্ত মুসলিম নিহত হয়েছে তাদের জন্য মুযাহিদিনদের কাফফারা বা দিয়ত (রক্তমূল্য) দিতে হবে না। এবং মুসলিম নিহত হতে পারে এই আশংকায় কোন হামলা পরিচালনা থেকেও বিরত থাকা যাবে না।)

কেননা জিহাদ হল ফরয, আর ফরয পালনের সাথে দন্ড যুক্ত হতে পারে না। জীবনাশংকাপূর্ন ক্ষুধার সময় অন্যের মাল গ্রহণের বিষয়টা ভিন্ন। কেননা ক্ষতিপূরণের ভয়ে কেউ তা থেকে বিরত থাকে না। কারণ তাতে নিজের জীবন বাচানোর বিষয় আছে। পক্ষান্তরে জিহাদের ভিত্তি হল প্রাণ নাশ করার উপর। সুতরাং ক্ষতিপূরণের ভয়ে তা থেকে বিরত থাকতে পারে।

ইমাম কুদুরি রহঃ বলেন, মুসলিম বাহীনির সাথে নারীদেরকে এবং কোরআন শরীফ নিয়ে যাওয়াই বাধা নেই, যদি এমন বড় বাহিনী হয় যার নিরাপত্তার উপর নির্ভর করা যায়। কেননা এক্ষেত্রে নিরাপত্তাই প্রবল, আর যা প্রবাল তা

সুনিশ্চিতের মত। কিন্তু নিরাপদ নয় এমন ক্ষুদ্র বাহীনির সাথে নিয়ে যাওয়া মাকরুহ।
কেননা এতে তাদের জান ও মান সম্মান বিনষ্ট করার সম্মুখীন করা হয়। আর কোরআন শরীফকে অসম্মানের মুখে ফেলা হয়। কেননাঃ মুসলমানদের প্রতি ক্রোধঃবসত তারা কোরআনের অবমাননা করে বসবে। আর এটাই হল নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত নিষেধ বাণির সঠিক ব্যাখ্যা। 'শত্রু ভূমিতে কোরআন নিয়ে সফর কর না'

পক্ষান্তরে কোন মুসলমান যদি নিরাপত্তা নিয়ে তাদের দেশে প্রবেশ করে এবং তারা যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী হয়, তাহলে সাথে কোরআন শরীফ বহন করাই কোন দোষ নেই। কেননা এক্ষেত্রে হস্তেক্ষেপ না করাই স্বাভাবিক।

বড় বাহীনিতে বয়স্কা নারীদের তাদের উপযোগী সেবাকর্মে অংশ নেওয়ার জন্য বের হওয়াতে বাধা নেই। যেমন, রান্না, পানি পান করান, শুশ্রসা করা। পক্ষান্তরে যুবতীদের ক্ষেত্রে গৃহে অবস্থান করাই অধিক ফেতনা রোধক।

আর বিনা প্রয়োজনে বয়স্কা নারীরাও প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবে না। কেননা এটা দ্বারা মুসলমানদের দুর্বলতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু সহবাস ও খিদমতের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে নেওয়া ভাল নয়। যদি একাজে নিতেই চাই তবে স্বাধীন নারীদের চাইতে দাসীদের নেওয়া ভাল।

স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া লড়াই করবে না। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তবে শত্রু যদি কোন শহরের উপর চড়াও হয়; প্রয়োজনের তাগিদে।"

(প্রতিরক্ষামূলক জিহাদে স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি এবং দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। জিহাদে যখনই ফারদুল আইন হবে তখনই এই বিধান প্রযোজ্য হবে।)

"মুসলিমদের উচিত তারা যেন বিশ্বাস ভঙ্গ না করে, গনিমতের মাল চুরি না করে এবং লাস বিকৃত না করে। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
'তোমরা গনিমতের খেয়ানত কর না, বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং লাস বিকৃত কর

না।’ এর অর্থ হল গনিমতের মাল থেকে চুরি করা আর হক খেয়ানত করা এবং চুক্তি ভঙ্গ করা।

আর উপরোক্ত ঘটনায় লাস বিকৃতের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা পরবর্তী নিষেধাজ্ঞা দ্বারা রহিত। এরূপই বর্ণিত হয়েছে।”

“আর স্ত্রীলোক, বালক, অতিবৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও অন্ধকে হত্যা করবে না। কেননা আমাদের মতে লড়াই হচ্ছে হত্যার বৈধতা দান কারী। আর তাদের দ্বারা তো লড়াই হয় না। একারণে এক পাশ যাদের অবশ এবং যাদের ডান হাত কর্তিত এবং যাদের হাত ও পা বিপরীতভাবে কাটা, তাদের হত্যা করা যায় না।

অতি বৃদ্ধ, পঙ্গু ও অন্ধ সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (র) আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা তার মতে কুফর হল হত্যার বৈধতা দানকারী। আমরা যা বর্ণনা করেছি তাই হল এর বিপক্ষ প্রমাণ।

আর বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বালক ও নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন এবং একবার এক নিহত নারীকে দেখতে পেয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আহা, এতো লড়াইকারী ছিল না। তাহলে কেন একে হত্যা করা হল?

গ্রন্থকার বলেন, তবে কেউ যদি যুদ্ধে বুদ্ধি বা পরামর্শদারা হয় কিংবা স্ত্রীলোক যদি অধিপতি হয়। কেননা তার অনিষ্ট অন্য লোকদের পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। তদ্রুপ এদের কেউ যদি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে তাহলে তাদের অনিষ্ট রোধ করার জন্য তাদের হত্যা করা যাবে। তাছাড়া কারণ এই যে, তাদের পক্ষ থেকে লড়াই মূলত কতলকে বৈধতা দান করে। আর কোন পাগলকে হত্যা করবে না। কেননা সে শরিয়াতের সম্বোধন পাত্র নয়। তবে সে যদি লড়াই করে তবে তার অনিষ্ট রোধ করার জন্য তাকে হত্যা করা হবে।”

(এখানে নয় প্রকারের কাফিরকে বেসামরিক নাগরিক হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
১। নারী ২। বালক (শিশু) ৩। অতি বৃদ্ধ ৪। প্রতিবন্ধী ৫। অন্ধ ৬। এক পাশ অবশ (পক্ষাঘাতগ্রস্থ) ৭। ডান হাত কর্তিত ৮। বিপরীতদিক থেকে হাত ও পা কাটা (ডান হাত বাম পা অথবা বাম হাত ডান পা) ৯। পাগল বা উন্মাদ

আল্লামা কাসানী তার বাদাউস সানায়ে গ্রন্থে আরও তিন প্রকারের কাফিরকে বেসামরিক লোক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। (উক্ত গ্রন্থের পূর্ণ ইবারত নিচে দেওয়া হয়েছে)

১০। গীর্জাতে অবস্থানরত সন্ন্যাসী ১১। মানুষ থেকে বিচ্ছিন হয়ে পাহাড়ে ভ্রমণকারী পর্যটক ১২। কোন ঘর কিংবা উপসনালয়ে দরজা বন্ধ করে অবস্থানরত দুনিয়াত্যাগী

সুতরাং হানাফী মাযহাবের রায় অনুসারে উক্ত বার প্রকার কাফির বেসামরিক নাগরিক বলে গন্য হবে। অবশিষ্ট যত লোক আছে (অর্থাৎ সকল যুদ্ধসক্ষম পুরুষ নাগরিক) তারা সকলে সামরিক লোক বিবেচিত হবে এবং তাদের যুদ্ধের সময় হত্যা করা যাবে, বন্দী অবস্থায়ও হত্যা করা যাবে। আইএস কর্তৃক ২০১৪ সালে দুই জন আমেরিকান, দুই জন ব্রিটিশ ও একজন জাপানী নাগরিককে শিরশ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। তিন জন ফরাসী নাগরিক ও কয়েকজন ইতালীয়, স্প্যানিশ নাগরিককে তারা মোটা অংকের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দেয়। মুক্তিপণ না পেলে তাদেরকেও হত্যা করা হত। আল কায়দা ইয়েমেন শাখা একজন ব্রিটিশ নাগরিককে বন্দী করে এবং মুক্তিপণ দাবী করে। পরে আমেরিকা সেখানে অভিযান চালাতে গেলে আল কায়দার মুযাহিদিনরা তাকে হত্যা করে। একিউএপি ও একিউআইএম বেশ কিছু ইউরোপীয় নাগরিক আটক করে তাদের সরকার থেকে ১২৫ মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ আদায় করে। যেসব দেশ মুক্তিপণ দিতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এই সমস্ত হার্বি কাফিরদের হত্যা বা বন্দী করার সময় তারা শুধু বিবেচনা করেছে সে কোন দেশের নাগরিক। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত কিনা সেটা তাদের বিবেচ্য বিষয় ছিল না। এই জন্য অনেক মুসলিম আল কায়দা এবং আইএসের সমালোচনা করেছে। তাদের অভিযোগ, এই সমস্ত সংগঠন ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে না। ইসলাম নীরিহ মানুষ হত্যা সমর্থন করে না। কারণ কোরআনে বলা হয়েছে যে একজন নীরিহ মানুষ হত্যা করল সে সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করল। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি হানাফী মাযহাবের মাসআলা অনুসারে দারুল হারবের যে কোন কাফির নাগরিক হত্যা করা বৈধ। আইএস যাদের শিরশ্ছেদ করেছিল তাদের মধ্যে একজন ব্রিটিশকে মুসলিমদের থেকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল, তাই তাকে হত্যা করা জায়েজ হয় নি। অবশিষ্ট সকল কাফিরকে হানাফী মাযহাবের মাসআলা অনুসারে হত্যা করা বৈধ ছিল।

কারণ তারা কেউই পঙ্গু ছিল না, বৃদ্ধ ছিল না, শিশু ছিল না, অন্ধ ছিল না, পাগল ছিল না, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল না, হাত পা কাটা ছিল না, জনমানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন পর্যটকও ছিল না। তারা ঘরের দরজা বন্ধ করে সন্ন্যাসব্রতও পালন করছিল না। তাই তাদেরকে হানাফী মাযহাব অনুসারে হত্যা করা বৈধ হয়েছিল।

২য় জুলাই ঢাকার গুলশানে হোলি আর্টিজান বেকারিতে আইএস জাপানি ও ইটালি নাগরিকদের হত্যা করে। এদের মধ্যে যারা নারী ছিল তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ হয় নি উপরে বর্ণিত মাসআলা অনুসারে। তবে পুরুষদের হত্যা করা জায়েজ হয়েছে। কারণ সেখানে সবাই যুদ্ধ সক্ষম পুরুষ ছিল। একজন অতি বৃদ্ধ ছিল। তবে কিতাবে অতি বৃদ্ধ বলতে এমন বৃদ্ধকে বুঝান হয়েছে যে হাটতে চলতে পারে না। জাপান থেকে বাংলাদেশে এসেছে এবং কাজ করতে সক্ষম এমন বৃদ্ধের কথা এখানে বলা হয় নি। হানাফী মাযহাবের কিতাবে কোথাও নেই ডাক্তার বা প্রকৌশলী হলে তাকে হত্যা করা যাবে না। কে ক্রিকেট খেলে আর কে ফুটবল খেলে তাও বিবেচনায় নেওয়া হয় নি। কে কৃষক আর কে শ্রমিক, কে ধনী আর কে গরীব কোন কিছুই বিবেচনায় নেওয়া হয় নি। সামরিক বেসামরিক নাগরিকের সংজ্ঞা নির্ধারণের সময় কে কোন পেশায় নিয়জিত তা বিবেচনায় করা হয় নি। সামরিক বেসামরিকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে শারিরিক ও মানসিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে।

মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া এর আমীনুত তা'লীম মুফতি আব্দুল মালেক সাহেব বলেছেন গুলশান হামলায় নিহত সবাই মুসলিমদের থেকে নিরাপত্তা (আমান) প্রাপ্ত ছিল। কারণ তারা সবাই ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে অবস্থান করছিল। তিনি বলেছেন ভিসা হচ্ছে নিরাপত্তা চুক্তি এ ব্যাপারে ইজমা আছে। কোথায় কবে ইজমা হল তিনি উল্লেখ করেন নাই। মুযাহিদ উলামাগণ যারা আছেন তাদের অধিকাংশই ভিসাকে নিরাপত্তা চুক্তি মানেন না। অথচ একজন মুসলিমও দ্বিমত করলে সে বিষয়ে ইজমা হয় না। তাই উনার দাবী সম্পুর্ন অগ্রহণযোগ্য। ভিসা প্রথা চালু হয়েছে মাত্র কয়েক দশক আগে। ফলে এ বিষয়ে পুর্ববর্তী ফুক্বাহাদের কোন মতামতও নেই। সুতরাং এ বিষয়ে বর্তমানে কিয়াস করা ছাড়া অন্য কোন উপাই নেই। ভিসা বিষয়ে বিস্তারিত আলাদা অনুচ্ছেদে লিখার প্রয়োজন রয়েছে। তবে গুলশান হামলার বৈধতার বিষয়ে স্বল্প কথায় বলা যায় যে, ভিসাকে নিরাপত্তা চুক্তি হিসাবে গ্রহণ করলেও গুলশানে নিহত কাফিররা নিরাপত্তা প্রাপ্ত ছিল না। কারণ

মুসলিমদের নিকট কোন মুরতাদের প্রদত্ত ভিসার সামান্যতম মূল্যও নেই। শেখ হাসিনা ও তার সরকারের লোকজন ত্বগুত ও মুরতাদ। শেখ হাসিনার মতে বাংলাদেশে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যে কারও কটূক্তি করার অধিকার আছে। যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিয়ে কটূক্তি করার অধিকার স্বীকার করে সে মুসলিম থাকতে পারে না। বাংলাদেশের মুসলিমদের বড় অংশ শেখ হাসিনাকে মুরতাদ মনে করে। যারা করে না তারা হয় সরকারের উচ্ছিষ্টভোগী নতুবা তার হাতে তসবীহ, মাথার পট্টি দেখে বিভ্রান্ত হয়ে তাকে মুসলিম মনে করেছে। শেখ হাসিনার উচ্ছিষ্টভোগী যে কারো বিরুদ্ধে মুযাহিদিনরা যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হোক সে বড় আলিম বা বড় জালিম। (ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলাদা অনুচ্ছেদে আলোচনা করার ইচ্ছা রয়েছে)

গুলশান হামলায় নিহত নারীদের ব্যাপারে কিছু কথা না বললেই নয়। পূর্ববর্তী যুগে সকল ধর্মের নারীরাই ঘরের কাজে নিয়োজিত থাকত। তারা সাধারণত ঘরের বাহিরের কাজে জড়িত হত না। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমা দেশের নারী ও পুরুষের কাজের ধরণের মধ্যে পার্থক্য করা খুবই কঠিন। পশ্চিমা বিশ্ব নারীদের পুরুষের সমানাধিকার দিয়েছে। তাদের দেশে নারী যে কাজ করে পুরুষও সে কাজ করে। পুরুষ রজনীতি করে, নারীও করে। পুরুষ ফুটবল খেলে, নারীও খেলে। পুরুষ ভোট দেয়, নারীও দেয়। পুরুষ ট্যাক্স দেয়, নারীও দেয়। পুরুষ সাংবাদিকতা করে, নারীও করে। মুযাহিদিনরা যদি কাফির পুরুষের সাথে যে আচারণ করে তার সমান আচারণ কাফির নারীদের সাথে না করে তবে সে দেশের নারীদের সমানাধিকার ক্ষুন্ন হবে। তাই বর্তমান যুগে কিয়াস করার অবকাশ আছে যে নারীরাও পুরুষের মত সামরিক লোকের অধিকার ভোগ করবে। সুতরাং তাদের হত্যাও বৈধ। তবে হারাম থেকে নিরাপদ দুরুত্বে অবস্থান করার জন্য কাফির নারীদের হত্যা না করাই উত্তম। তবে কেউ যদি কিয়াস করে তাদের সামরিক নাগরিকের অধিকার দেওয়ার মাধ্যমে নারী সমানাধিকার নিশ্চিত করে তবে আমাদের উচিত হবে না সে হত্যাকে নাজায়েজ বলা। তাই আমি গুলশানে নিহত নারীদের হত্যাকে নাজায়েজ বলতে অপরাগ। গুলশানে নিহত নারীরা এমন কাজে বাংলাদেশে অবস্থান করছিল যা সাধারণত পুরুষদেরই শোভা পাই।

ইমাম শাফেয়ী রহঃ এর একটি কওল এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। উনি মনে করতেন অতি বৃদ্ধ, পঙ্গু ও অন্ধ সামরিক লোক। শাফেয়ী মাযহাবে বৃদ্ধ, পঙ্গু

ও অন্ধ যদি সামরিক লোক হয় তবে যুদ্ধসক্ষম পুরুষরা তো অবশ্যই সামরিক লোক হবে। শাফেয়ী মাযহাব যারা অনুসরণ করেন তারা যদি অন্ধ বা পঙ্গু কোন কাফিরকে হত্যা করে তবে নিশ্চয়ই সে এই জন্য জঙ্গী, সন্ত্রাসী হবেন না। আর হত্যাকারী যদি জঙ্গী, সন্ত্রাসী হন তবে ইমাম শাফেয়ী তার আদর্শিক গুরু হিসাবে কি হবেন? ঐতিহাসিকভাবে মুসলিমদের মধ্যে এই ধারা চালু হয়ে আসছে যে এক মাযহাবের অনুসারীরা অন্য মাযহাবের অনুসারীদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন কিন্তু তাদের বাতিল আখ্যায়িত করেন না। সুতরাং হানাফিদেরও উচিত হবে না শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের সমালোচনা করা যদিও বা তারা অন্ধ বা পঙ্গু কাফিরকে হত্যা করে।)

"অবশ্য বালক ও পাগলকে যতক্ষন তারা লড়াইরত থাকে ততক্ষন হত্যা করা যাবে। পক্ষান্তরে অন্যদের বন্দী করার পরেও হত্যা করতে বাধা নেই। কেননা শরীয়াতের সম্ভোধন তাদের অভিমুখী হওয়ার কারণে সে শাস্তির পাত্র।

যদি কখনও সুস্থ থাকে আবার কখনও মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটে তাহলে সুস্থ অবস্থায় সে সুস্থ ব্যাক্তির সমতুল্য।"

(এখানে খেয়াল করুন পাগল যদি কখনও সুস্থ হয় তবে সুস্থ হওয়ার পরে তাকে হত্যা করা যাবে। পাগল অবস্থায় নিশ্চয় সে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল না। এখন সে সুস্থ হওয়া মাত্রই তাকে হত্যা করা জায়েজ। এখান থেকে বুঝা যায় কাউকে হত্যা করার কারণ তার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা নয়, বরং তার যুদ্ধ করার শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা থাকা। যখন সে পাগল ছিল তখন সে মানসিকভাবে ভাবে যুদ্ধে অক্ষম ছিল তাই তাকে হত্যা করা হারাম ছিল আর যখন সে সুস্থ হল তখন সে যুদ্ধ করার সক্ষমতা অর্জন করল। তাই তাকে হত্যা করাও জায়েজ হয়ে গেল।)

মুশরিক পিতাকে নিজে অগ্রগামী হয়ে হত্যা করা মাকরুহ হবে।

কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

'দুনিয়ার জীবনে সদাচারণের সাথে তাদের সংগ দান কর।'

তাছাড়া এজন্য যে, পুত্রের তো কর্তব্য হলো ভরণ পোষণের মাধ্যমে পিতার জীবন রক্ষা করা। সুতরাং তার প্রাণ নাশের নিঃশর্ত অনুমতি প্রদান করা এর পরিপন্থী। যদি সে তাকে সামনে পেয়ে যায় তাহলে নিজে এমনভাবে বাধাগ্রস্থ করতে যাবে,

যাতে অন্য কেউ হত্যা করতে পারে। কেননা নিজে গোনাহে লিপ্ত না হয়ে অন্যের দ্বারাই উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে।

আর পিতা যদি তাকে হত্যা করতে এমনভাবে উদ্যত হয় যে, হত্যা করা ছাড়া তাকে রোধ করা সম্ভব না হয় তবে তাকে হত্যা করায় কোন দোষ নেই। কেননা তার উদ্দেশ্য তো হল আত্মরক্ষা করা।

হানাফী মাযহাবের আরেকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বাদাউস সানায়ে থেকে সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকের সংজ্ঞা, লড়াইয়ের পদ্ধতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ তুলে ধরছি। আল হিদায়ার সঙ্গে খুব বেশী পার্থক্য নেই, তবে এই কিতাবে আরও বিস্তারিতভাবে হানাফী মাযহাবের মাসআলা বর্ণিত আছে।

কিতাবঃ বাদায়েউস সানায়ে' ফি তারতিবুশ শারায়ে'

সংকলকঃ ইমাম আবু বকর আলা আল দ্বীন কাসানী

পরিচ্ছেদঃ কাফিরদের মধ্য থেকে কাকে হত্যা করা বৈধ আর কাকে হত্যা করা বৈধ নয়। খণ্ড ৭ প্রিষ্টা ১০১

"কুফরের কারণে কাকে হত্যা করা বৈধ আর কাকে হত্যা করা বৈধ নয়" এই ব্যাপারে আমরা বলবো- এখানে অবস্থা নিম্নের সুরত সমূহের মধ্য হতে কোন একটি সুরত থেকে খালি নয়।

১/ হয়তো তা যুদ্ধের সময় হবে।

২/ অথবা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরবর্তী অবস্থা হবে। আর তা হল কাফেরকে গ্রেফতার ও বন্দী করার পর হত্যা করা।

১ম সুরতঃ যদি পরিস্থিতি যুদ্ধকালীন হয়, তবে এ পরিস্থিতিতে (১) নারী (২) শিশু (৩) অতিবৃদ্ধ (৪) পঙ্গু (৫) পক্ষাঘাতগ্রস্থ (৬) অন্ধ (৭) বিপরীত দিক থেকে হাত পা কর্তিত (৮) ডান হাত কর্তিত (৯) পাগল (১০) গীর্জাতে অবস্থানরত সন্ন্যাসী (১১) মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ে ভ্রমণকারী পর্যটক (১২) কোন ঘর কিংবা উপসানালয়ে দরজা বন্ধ করে অবস্থানরত দুনিয়াত্যাগীদের হত্যা করা বৈধ নয়।

মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা না জায়েজ হওয়ার দলীল-

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- «لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا وَلِيدًا» "তোমরা মহিলা ও সন্তানকে হত্যা করোনা!"

আরও বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক যুদ্ধে একজন নিহত মহিলাকে দেখতে পেলেন। অতঃপর এমনটি করতে নিষেধ করেছেন। রাসুল বললেন-

«هَاهُ مَا أُرَاهَا قَاتَلَتْ، فَلِمَ قُتِلَتْ؟ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» "আমি একজন নিহত মহিলা দেখতে পাচ্ছি, তাঁকে কেন হত্যা করা হয়েছে? রাসুল মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন"। কেননা এরা যুদ্ধকারী নয়। সুতরাং তাঁদেরকে হত্যা করা হবেনা। তবে যদি তাঁদের মধ্য থেকে কেউ লড়াই করে, তাঁকে হত্যা করা হবে। এমনিভাবে কেউ যদি লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে, মুসলমানদের গোপন তথ্য প্রকাশ করে, যদি তাঁর পরামর্শ বা রায়ের দ্বারা কুফর উপকৃত হয়, অথবা কাফেরদের অনুসৃত হয় (নেত্রী হয়), তাকেও হত্যা করা হবে। যদিও সে মহিলা বা শিশু হয়, কারণ তার থেকে পরোক্ষভাবে লড়াই পাওয়া যাচ্ছে।

যুদ্ধ সক্ষম সকল কাফির পুরুষকে তো এমনিতেই হত্যা করা যাবে। উপরন্তু নারী, শিশু বা অন্য যাদেরকে বেসামরিক লোক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে তারাও হত্যার যোগ্য যদি তারা পরামর্শ, মতামত, উৎসাহ বা উস্কানি দিয়ে কুফর শক্তিকে সাহায্য করে। কোন নারী সাংবাদিক বা বুদ্ধিজীবি যদি যদি তার লেখনীর মাধ্যমে কাফিরদের সহায়তা করে তবে তাকে হত্যা করা যাবে। বলা হয়েছে নারীদের পরামর্শ বা রায়ের মাধ্যমে যদি কুফর উপকৃত হয় তবে তাকে হত্যা করা হবে। বর্তমান যুগের ভোট হচ্ছে একটা মতামত। তাই কোন নারী যদি বারাক ওবামা বা জর্জ বুশকে ভোট দিয়ে থাকে তবে তার মতামত কুফরকে সহায়তা করেছে বলে কিয়াস করার অবকাশ রয়েছে। সব দেশেই একজন নারীর ভোট আর একজন পুরুষের ভোট সমান গুরুত্ববহন করে। ইউরোপে মধ্যযুগে নারীদের রাজনীতিতে কোন অধিকার ছিল না। তাই যদি জানা যায় যে কোন নারী বা অতি বৃদ্ধ বা পঙ্গু যাকে বেসামরিক লোক হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল সে ভোট দিয়েছে এমন কাউকে যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তবে ওই নারী বা বৃদ্ধ বা পঙ্গু হত্যার যোগ্য হবে উপরিক্ত মাসআলা অনুসারে।

বর্ণিত রয়েছে-

»أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ رَفِيعٍ السُّلَمِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَدْرَكَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ يَوْمَ حُنَيْنٌ، فَقَتَلَهُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ كَالْقَفَّةِ، لَا يَنْفَعُ إِلَّا بِرَ أْيِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ«

রবি' ইবনে সালামিয়াহ রাদিঃ হুনাইনের যুদ্ধের দিন দুরাইদ ইবনে সিম্মাহকে নিহত পেলেন, অথচ সে ছিল দুর্বল এক বৃদ্ধ, যার পরামর্শ বা রায় দিয়ে কাফেরদের উপকৃত হওয়া ছাড়া আর কোন লাভ ছিলনা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই সংবাদ পৌঁছালে রাসুল নিষেধ করেননি"। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল- প্রত্যেক ওই ব্যক্তি, যে যুদ্ধকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তাকে হত্যা করা বৈধ। চাই সে লড়াই করুক বা না করুক। আর প্রত্যকে ওই ব্যক্তি, যে যুদ্ধকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাকে হত্যা করা বৈধ নয়, তবে যদি সে বাস্তবে বা সশরীরে লড়াই করে, অথবা রায় বা পরামর্শ প্রদান, অনুসৃত হয়ে বা উদ্বুদ্ধ করে বা এই জাতীয় কোন কাজের দ্বারা পরোক্ষভাবে লড়াই করে, তাহলে তাকে হত্যা করা বৈধ।

১২ প্রকারের লোক ছাড়া অর্থাৎ সকল যুদ্ধ সক্ষম পুরুষ লোক যাদের সামরিক লোক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তাদের সবাইকে হত্যা করা বৈধ। তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহন করা এক্ষেত্রে কোন শর্ত না। যাদের সামরিক লোক হিসাবে সংগায়িত করা হয়েছে তাদের কেউ সারা জীবনেও যদি যুদ্ধ না করে বা কেউ সদ্য বালেগ হয়েছে তবুও তাকে হত্যা করা যাবে। ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী বালেগ হতে আঠার বছর বয়স হওয়ার প্রয়োজন নেই। নাভির নিচে গোপন পশম গজান অথবা পনের বছর বয়স- যেটি আগে হবে সেটিই তার বালেগ হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।

সুতরাং পুরোহিত বা যাজক (الْقِسِّيسُ), ওই সন্ন্যাসী যে মানুষের সাথে মিলামিশা করে, এবং যে কখনো পাগল থাকে আবার কখনো সুস্থ থাকে, বধির বা বোবা, বাম হাত কর্তিত ব্যক্তি, দুই পায়ের কোন এক পা কর্তিত ব্যক্তি, এই সকল লোকদের হত্যা করা বৈধ, যদিও তারা লড়াই না করে থাকে। কেননা তারা যুদ্ধকারীদের- ই অন্তর্ভুক্ত।

পুরোহিত বা যাজক (priest) সামরিক লোক হিসাবে বিবেচিত হানাফী মাযহাবে। তাই হানাফী ফিক্বহ অনুসারে যাজক বা পুরোহিত হত্যা করা জায়েজ। কেউ সন্ন্যাসী (Monk) আর যাজকের (priest) মধ্যে পার্থক্য গুলিয়ে ফেলবেন না। সন্ন্যাসীরা সাধারণত দুনিয়াত্যাগী হয়, কিন্তু যাজক বা পুরোহিত দুনিয়া ত্যাগি হয় না। ১২ প্রকারের বেসামরিক লোকের মধ্যে সান্ন্যাসী অনর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাজক নয়। বাংলার আইএস অনেকগুলো হিন্দু পুরোহিত হত্যা করেছে। হানাফী মাযহাবের রায় অনুসারে আইএস বা নব্য জেএমবি'র হিন্দু পুরোহিত হত্যা জায়েজ হয়েছে। গুলশানে নিহতদের ক্ষেত্রে ভিসার যে অযুহাত দেওয়া হয়েছিল এখানে সে অযুহাত অনুপস্থিত। বাংলাদেশের হিন্দুরা জিজিয়া দেয় না বা মুসলিমদের সাথে কোনরূপ সন্ধিচুক্তিও নেই তাদের। ফ্রান্সে, বেলজিয়ামে কিছু খৃস্টান যাজককে হতা করেছে আইএসের সৈনিকরা। হানাফী মাযহাবের এই মাসআলা অনুসারে খ্রিস্টান যাজক হত্যা শরিয়াহ সম্মত হয়েছে। সন্ন্যাসীরা বেসামরিক লোক হিসাবে বিবেচিত হবে তবে শর্ত হচ্ছে তাদের জনমানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্যান বা ইবাদতে মগ্ন থাকতে হবে। যদি তারা সমাজের সাথে মেলামিশা করে তবে তারা সামরিক লোক হিসাবে বিবেচিত হবে। পাগল যখন পাগল থাকবে তখন তাকে হত্যা করা যাবে না, কিন্তু যখন সে সুস্থ হবে তখন তাকে হত্যা করা যাবে। বধির বা বোবা অর্থাৎ যে কানে শোনে না বা যে কথা বলতে পারে না তাকে হানাফী মাযহাব সামরিক লোক হিসাবে রায় দিয়েছে। তাই বধির বা বোবা লোক হত্যা করা যাবে। দুনিয়ার কোন সেনাবাহিনী বধির বা বোবা লোককে চাকরী দেয় না, তারপরেও তাদেরকে হানাফী ফিক্বহ আহলুল ক্বিতাল বা সামরিক লোক বিবেচনা করে। সুতরাং বুঝায় যাচ্ছে সেনাবাহিনীতে চাকরী করা বা যুদ্ধ করা সামরিক লোক হওয়ার শর্ত না। বধির বা বোবা লোক যুদ্ধ করতে সক্ষম, তাই তাকে সামরিক লোক হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে হানাফী ফিকাহশাস্ত্র। ডান হাত কর্তিত ব্যাক্তিকে হত্যা করা যাবে না, তবে বাম হাত কর্তিত ব্যাক্তিকে হত্যা করা যাবে। দুই পা কাটা লোককে হত্যা করা যাবে না, তবে যে কোন এক পা কাটা লোককে হত্যা কর যাবে। এই সকল লোকদের (যাজক, বোবা, বধির, বাম হাত কাটা, এক পা কাটা) হত্যা করা বৈধ, যদিও তারা লড়াই না করে থাকে। কেননা তারা যুদ্ধকারীদের- ই অন্তর্ভুক্ত। হানাফী ফিক্বহ অনুসারে কাউকে হত্যা করার জন্য তার সামরিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াই যথেষ্ট। তার বাস্তবে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করার কোন শর্ত নেই।

সুতরাং উল্লেখিত কাউকে যদি হত্যা করা হয়, যাকে হত্যা করা বৈধ নয়, তাহলে কোন দিয়্যত বা কাফফারা দিতে হবেনা। তবে তাওবা ও ইস্তেগফার করতে হবে। কেননা কাফেরের রক্ত কোন মুল্য রাখেনা, তবে যদি সে আমানপ্রাপ্ত হয় তাহলে মুল্য রাখে, কিন্তু এই সুরতে তার আমান পাওয়া যায়নি।

বেসামরিক লোক যাদের হত্যা করা হারাম তাদের যদি ইচ্ছাকৃতভাকবে হত্যা করা হয় তবে হত্যাকারী গোনাহগার হবে এবং তাকে এই জন্য তওবাহ ইস্তিগফার করতে হবে। তওবাহ ইস্তিগফার করলে ইনশাল্লাহ সে গোনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর এই জন্য তাকে দুনিয়াতে কাফফারাহ বা রক্তমুল্য দিতে হবে না। সুতরাং গুলশানের হত্যাকারীরা নারীদের হত্যা করে যদি গোনাহ করে থাকে তবে সেটা ছগীরাহ গুনাহ করেছে। তওবাহ ইস্তিগফার করলেই তারা মাফ পেয়ে যেত, কিন্তু তারা সে সুযোগ পায় নি। তবে শহীদের রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে পরার আগেই তার সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয় তাই তাদের নারী হত্যার মাধ্যমে ছগীরাহ গোনাহ হলেও তা মাফ হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ। আমান বা নিরাপত্তা প্রাপ্ত কাউকে হত্যা করা হলে সেটা অনেক বড় গোনাহের কাজ। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে মুআহিদ (জিম্মি বা আমান প্রাপ্ত কাফির) হত্যা করলো সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছর দূর থেকেও পাওয়া যায়। গুলশানের হত্যাকারীরা শেখ হাসিনাকে মুরতাদ মনে করত, এবং আমরা যারা শেখ হাসিনাকে মুরতাদ মনে করি, তাদের মতে শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে দেওয়া ভিসা আমান হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রাসংগিক ভাবে একটা কথা বলা জরুরী যে, মুরতাদ বারাক ওবামা সহ প্রায় সকল মডারেট মুসলিম কোরআনের একটা আয়াত উদ্ধৃত করে থাকে। সূরাহ মায়েদার ৩২ নম্বর আয়াত যেখানে বলা হয়েছে একজন মানুষ হত্যা করলে সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করা হয়। কাফির নারী শিশু যাদের সাথে মুসলিমদের কোন রূপ নিরাপত্তা চুক্তি নেই তাদের হত্যা করলে দুনিয়াতে কোন কাফফারা বা রক্তমূল্য দিতে হবে না। শুধু তওবাহ ইস্তিগফার করলেই যথেষ্ট হবে। সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার জন্য কোন কাফফারাও নেই, রক্তমূল্যও নেই! তওবাহ ইস্তিগফারই যথেষ্ট! অথচ শপথ ভঙ্গ করলেও কাফফারা দিতে হয়। একজন মুসলিমকে অনিচ্ছাকৃত হত্যা করলেও রক্তপণ দিতে হয়। সুতরাং বোঝায় যাচ্ছে

সমগ্র মানব জাতিকে হত্যার বিধানটি অচুক্তি বদ্ধ কাফিরের জন্য প্রযোজ্য নয়। হানাফী মাযহাবের ফিক্বহ হতে অন্তত আমরা এটাই জানতে পারি।

২য় সুরতঃ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কাফেরকে হত্যা করা। আর সেটা হল গ্রেফতার বা বন্দী করার পর হত্যা করা। এক্ষেত্রেও মূলনীতি হল যাকে যুদ্ধ চলাকালীন হত্যা করা জায়েজ নয়, তাকে যুদ্ধের পরও হত্যা করা জায়েজ নয়। আর যাকে যুদ্ধ চলাকালীন তার সশরীরে বা পরোক্ষভাবে লড়াইয়ের কারণে হত্যা করা জায়েজ, তাকে বন্দী বা গ্রেফতারের পরও হত্যা করা জায়েজ। তবে শিশু, এমন বিকলাঙ্গ, যার আকল নেই, তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তাদেরকে যুদ্ধ চলাকালীন তাদের সশরীরে বা পরোক্ষভাবে লড়াইয়ের কারণে হত্যা করা বৈধ। যুদ্ধের পর বন্দী অবস্থায় তাদের হত্যা করা বৈধ নয়। যদিও তারা যুদ্ধ চলাকালীন মুসলমানদের একটি জামাআতকে হত্যা করে। কেননা বন্দি করার পর হত্যা করা হচ্ছে শাস্তিস্বরূপ। আর এরা শাস্তিগ্রহনের উপযুক্ত নয়। আর যদি তাদের যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করা হয়, তাহলে সেটা হবে যুদ্ধের ক্ষতি দূর করার জন্য। আর যখন তাদের থেকে ক্ষতি পাওয়া গেল, সুতরাং ক্ষতি দূর করার জন্য, তাদের হত্যা করা বৈধ। আর বন্দী করার দ্বারা ক্ষতির আশংকা দূর হয়ে যায়। সুতরাং এর পর হত্যা করা হবে শাস্তিস্বরূপ আর সে শাস্তির উপযুক্ত নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অধিক জানেন।

আর মুসলিমের জন্য অনুচিত যে তার হারবি (যুদ্ধকারী) পিতাকে যুদ্ধে প্রথমে হত্যা করবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

{ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15]

দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। সুরা লুকমান-১৫ আল্লাহ তায়ালা কাফের পিতামাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর প্রথমেই হত্যা করা সদাচরণ নয়।

বর্ণিত আছে,

»أَنَّ حَنْظَلَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - غَسِيلَ الْمَلَائِكَةِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَتْلِ أَبِيهِ، فَنَهَاهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ«-

“হানজালা রাদিঃ –তিনি ফেরেশতা কর্তৃক গোসলপ্রাপ্ত।– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তার পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চেয়েছেন। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিষেধ করেছেন”। কেননা শরীয়ত তাকে জীবন ধারণের জন্য সন্তানের উপর ভরণপোষণের নির্দেশ দিয়েছে, এক্ষেত্রে তাকে হত্যার নির্দেশ তা নষ্ট করে দেয়। আর একটি আরেকটির বিপরীত। যদি পিতা তাঁকে হত্যা করতে চায়, তাহলে সে তা প্রতিহত করবে। যদি পিতা তাঁর উপর বিজয়ী হয়ে যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে সে হত্যা করতে পারবে। কেননা এটা আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রতিহত করতে গিয়ে হত্যা করার ইচ্ছা করবেনা, কেননা এটার প্রয়োজনীয়তা নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অধিক ভালো জানেন।

অনেক মুযাহিদের পিতা ত্বগুত বা মুর্তাদ। তাদের উচিত হবে না নিজের পিতাকে হত্যা করার মাধ্যমে নিজের ঘর থেকেই জিহাদ শুরু করা।

পরিচ্ছেদঃ যুদ্ধ ও শত্রু মুখোমুখি হওয়ার সময় যুদ্ধ শুরু করতে যে বিষয় গুলো একজন যোদ্ধার উপর ওয়াজিব, তার বর্ণনা।

যাই হোক যুদ্ধ ও শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পর যুদ্ধ শুরু করতে যে বিষয় গুলো একজন যোদ্ধার উপর ওয়াজিব, তার সম্পর্কে আমরা বলবো- আল্লাহ তায়ালার তাওফিকে- এক্ষেত্রে বিষয়টি দুটি অবস্থার কোন একটি থেকে খালি নয়। ১/ হয়তো শত্রুদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে থাকবে।

২/ অথবা তাঁদের কাছে দাওয়াত পৌছবে না।

যদি তাদের কাছে দাওয়াত না পৌঁছে, তাহলে মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হল প্রথমে তাদেরকে যবান দ্বারা ইসলামের দিকে আহবান করা।

দলিলঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ-

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل: 125]

অর্থঃ আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। সুরা

নাহল-১২৫

মুসলমানদের জন্য দাওয়াতের পূর্বে যুদ্ধ করা জায়েজ নয়। কেননা ঈমান আনয়ন যদিও দাওয়াতের পূর্বে শুধুমাত্র আকলের দ্বারাই ওয়াজিব। ফলে ঈমান না আনার কারণে তারা হত্যার উপযুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাসুল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) প্রেরণের পূর্বে তাদের সাথে যুদ্ধকে হারাম করেছেন। এবং তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো হচ্ছে এটার অতিরিক্ত একটি বিষয় ও অনুগ্রহ করা, যাতে তাদের ওজর পেশ করার কোন অবস্থা না থাকে। যদিও বাস্তবে তাদের কোন ওজর নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য ওই সকল আকলি দলীল কায়েম করেছেন, সেগুলো নিয়ে যদি তারা যথাযথ চিন্তা করে এবং সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়, তাহলে তারা প্রকৃতই আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করে তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। যাতে তাদের ওজর পেশ করার সামান্যতম অবকাশও না থাকে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

{فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ} [القصص:47

অর্থঃ তারা বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম । সুরা কাসাস-৪৭

যদিও বাস্তবে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো না হয়, যা আমরা পূর্বে স্পষ্ট করেছি। কেননা যুদ্ধ শুধুমাত্র যুদ্ধের জন্য ফরজ করা হয়নি বরং ইসলামের দাওয়াতের জন্য ফরজ করা হয়েছে।

আর দাওয়াত হচ্ছে দুই প্রকারঃ

১/ দাওয়াত বিল বানান। আর সেটা হচ্ছে যুদ্ধ।

২/ দাওয়াত বিল লিসান। আর তা হয় তাবলীগ বা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে। আর দ্বিতীয়টি প্রথমটির চাইতে সহজ। কেননা যুদ্ধের মধ্যে দেহ, মাল ও জানের আশংকা থাকে। আর তাবলীগ বা পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে এগুলোর কিছুই থাকেনা।

সুতরাং যখন দুই দাওয়াতের সহজটির মাধ্যমে মাকসাদ অর্জন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন শুরুতে সেটা গ্রহণ করাই উত্তম। এই আলোচনা হচ্ছে যখন তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছায়নি এমন সুরতের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর যদি তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে থাকে, তাহলে দাওয়াতের নবায়ন ব্যতীতই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা জায়েজ। যার দলীল আমরা পূর্বে স্পষ্ট করেছি। কেননা হুজ্জত বা প্রমাণ হচ্ছে আবশ্যকীয় বিষয়। আর বাস্তবে ওজর পেশ করার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর একবার দাওয়াত দেওয়ার দ্বারা ওজর পেশ করার সামান্যতম অবকাশও শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এতদাসত্তেও উত্তম হল দাওয়াত নবায়ন করার পরই যুদ্ধ শুরু করা হবে। যাতে সব দিক থেকে তাদের সাড়া দেওয়ার সুযোগ থাকে।

এখানে আলোচনা হচ্ছে আক্রমানাত্মক জিহাদের। বর্তমানে মুসলিমরা আক্রান্ত, তাই এখন কাফিরদের দাওয়াত দেওয়ার সামান্যতম প্রয়োজনও নেই।

বর্ণিত আছে যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের সাথে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করা পর্যন্ত যুদ্ধ করতেন না। তিনি তাদের একাধিকবার দাওয়াত দিতেন। এই বর্ণনা এই কথা বুঝায় যে, দাওয়াত নবায়ন করার পর যুদ্ধ শুরু করা উত্তম। অতঃপর যখন তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করা হবে, যদি তারা মেনে নেয়, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা হবে।

কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا»

অর্থঃ আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, যখন তারা ইহা বলে ফেলবে, তখন তাদের রক্ত ও মাল আমার থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে, তবে শরীয়তের কোন হক নয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন-

«مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي دَمَهُ وَمَالَهُ»

অর্থঃ যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, আমার থেকে তার রক্ত ও মাল নিরাপদ হয়ে যাবে।

যদি তারা ইসলামের দিকে সাড়া না দেয়, তাদেরকে জিম্মাহ তথা ট্যাক্সের দিকে আহবান করা হবে, তবে আরবের মুশরিক ও মুরতাদদের জন্য এই সুযোগ নেই।

আমরা পরবর্তীতে এই বিষয়ে আলোচনা করবো।

যদি তারা সাড়া দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা হবে।

তার দলীল হচ্ছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

»فَإِنْ قَبِلُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَبَوْا، اسْتَعَانُوا بِاللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عَلَى قِتَالِهِمْ«

অর্থঃ যদি তারা জিম্মাহর চুক্তি গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দাও যে, মুসলিমদের যেই অধিকার, তাদেরও সেই অধিকার রয়েছে, মুসলিমদের উপর যা ওয়াজিব, তাদের উপর তা ওয়াজিব। যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য চাওয়া হবে"।

মুসলিমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে নিজেদের চেষ্টা প্রচেষ্টার, ও সর্বোচ্ছ সামর্থ ব্যয় করার পর কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করবে। এবং অটল থাকবে ও আল্লাহ তায়াল ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করবে। এবং বেশি বেশি আল্লাহ তায়ালা ওই সকল জিকির করবে, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

{ -يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الأنفال: 45]

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা

{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 46]

অর্থঃ আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে। সুরা আনফাল-৪৬

এবং তাদের প্রতি নির্দেশ হল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যদিও দাওয়াতের দ্বারা শুরু না করে। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]

অর্থঃ মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, সুরা তাওবা-৫ এবং চাই তারা নিষিদ্ধ মাসসমূহে থাকুক বা না থাকুক, কেননা নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ হারাম হওয়াটা "সাইফের আয়াতের" দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। আর নিষিদ্ধ মাস সমূহের বাহিরে যুদ্ধ হারাম হওয়াটা "কিতালের আয়াতের" দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা এবং নৈশ আক্রমণ করাতে কোন সমস্যা নেই। তাদের ফলদার ও ফলবিহিন গাছগাছালি কেটে ফেলা ও তাদের ক্ষেতখামার নষ্ট করাতে কোন সমস্যা নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

} -مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5]

অর্থঃ তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশ এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন। সুরা হাশর-৫

এই আয়াতের মাঝে আল্লাহ তায়াল খেজুর বৃক্ষের কর্তনের অনুমতি দিয়েছেন। আর আয়াতের শেষের দিকে সতর্ক করেছেন যে, এটা হল শত্রুদেরকে অপমানিত করা ও ক্রোধান্বিত করার জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

{وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5

অর্থঃ যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন। সুরা হাশর-৫

তাদের দুর্গসমূহ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া, তাদের দুর্গ বা ঘরবাড়ি পানিতে ডুবানো, তাদের দুর্গসমূহ নষ্ট করা ও ধ্বংস করা, এবং তাদের দুর্গসমূহে মিঞ্জানিক দিয়ে আঘাত করাতে কোন সমস্যা নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

{يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ} [الحشر: 2]

তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। সুরা হাশর-২

কেননা এইসবগুলোই কিতাল বা যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে যে, এতে শত্রুকে রাগান্বিত, অপমানিত ও অপদস্ত করা হয়ে থাকে। কেননা মালের হুরমত সাব্যস্থ হয় মালিকদের হুরমতের কারণে। আর এক্ষেত্রে নফস তথা মালিকের হুরমত নেই, এমনকি তাকে যুদ্ধে হত্যা করা হয়, সুতরাং মালের হুরমত আর কিইবা থাকবে? তাদের বিরুদ্ধে তীর নিক্ষেপ করাতেও কোন সমস্যা নেই। যদিও জানা থাকে যে, তাদের মাঝে মুসলিম বন্দী ও ব্যবসায়ীরা রয়েছে। কেননা এখানে জরুরত বা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যখন কাফেরদের থেকে খুব কম সংখ্যক মুসলিম বন্দী ও ব্যবসায়ী বাঁচতে পারবে। সুতরাং তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলে জিহাদের পথ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। কিন্তু তারা সেই কাফেরদের হত্যা করার ইচ্ছা করবেন, মুসলিমদের নয়। কেননা অন্যায়ভাবে মুসলিমদের হত্যা করার ক্ষেত্রে ইচ্ছা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

মুসলিম বন্দী বা ব্যবসায়ী থাকলেও যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা যাবে না। সেখানে কাফিরদের বেসামরিক লোকের কারণে যুদ্ধ বন্ধ করার তো কোন প্রশ্নই আসে না। এখানে কাফিরদের ঘর বাড়ি ধ্বংস করারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কেননা এইসবগুলোই কিতাল বা যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে যে, এতে শত্রুকে রাগান্বিত, অপমানিত ও অপদস্ত করা হয়ে থাকে। আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস করা উক্ত মাসআলা অনুসারে জায়েজ ছিল। হানাফী মাযহাবে ঘর বাড়ি ধ্বংস করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর ঘর বাড়িতে তো সামরিক বেসামরিক উভয় শ্রেণীর লোক থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। সাধারণ ঘর বাড়িতে নারী শিশু থাকে, অপরদিকে টুইন টাওয়ারে কোন শিশু ছিল না তবে নারী ছিল। কিন্তু এই সব নারীরা সেখানে অবস্থান করছিল এমন কিছু কাজের উদ্দেশ্যে যে কাজগুলো পুরুষের জন্যই শোভা পাই। সুতরাং ইসলাম যখন নারীদের বেসামরিক নাগরিকের

মর্যাদা দিয়েছিল তখনকার যুগের নারীদের ভূমিকা আর বর্তমান যুগের টুইন টাওয়ারের নারীদের ভূমিকার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। নারীদের বেসামরিক বিবেচনা করলেও হামলা করতে সমস্যা নেই কারণ যেখানে আলাদা করা যায় না সেখানে হামলার অনুমতি আছে। পরের লাইনে আছে মুসলিম শিশু আছে জানা থাকলেও হামলা থেকে বিরত থাকা যাবে না, সেখানে কাফির নারীদের কথা চিন্তা করে কিভাবে হামলা থেকে বিরত থাকা যাবে?

এমনিভাবে যদি তারা মুসলিম শিশুদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তবুও তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপে কোন সমস্যা নেই ফরজ প্রতিষ্ঠার জরুরতের কারণে। কিন্তু তাঁরা কাফেরদেরকেই ইচ্ছা করবে, মুসলিম শিশুদের নয়। যদি তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে, এবং তা কোন মুসলমানের শরীরে বিদ্ধ হয়, তাহলে কোন দিয়ত নেই, কোন কাফফারাহ নেই। হাসান ইবনে জিহাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন- দিয়ত ও কাফফারাহ ওয়াজিব হবে। এটা শাফিঈ রহিমাহুল্লাহর দুই কউলের একটি। হাসান এর উক্তি হল মুসলিমদের রক্ত নিষ্পাপ। সুতরাং নিক্ষেপ থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে ফরজ প্রতিষ্ঠার জরুরতের কারণে তা নিষিদ্ধ নয়, তাই তিনি জরুরত বা প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

“জরুরত এটা জবাদিহিতা দূর হওয়ার ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হবে, জরিমানা বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে নয়, যেমন পিপাসিত অবস্থায় কারো পানি পান করে ফেলা, তার জন্য এই পান করাটা বৈধ করা হবে কিন্তু জরিমানা দিতে হবে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানেও সেই রকমই হবে।”

আর বিষয় হল যেমনিভাবে কিতালের ফরজকে প্রতিষ্ঠার জন্য জবাবদিহিতাকে দূর করার প্রয়োজন সাব্যস্ত হয়, তেমনিভাবে জরিমানা বাতিলের প্রয়োজনীয়তাও সাব্যস্ত হয়। (আমাদের মতে) কেননা জরিমানা ওয়াজিব হওয়া এটা কিতালের ইকামতে ফরজের প্রতিবন্ধক হয়। কেননা এতে তাঁরা জরিমানা আবশ্যক হয়ে যাওয়ার ভয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। আর ওই বস্তুকে ওয়াজিব করা, যা ওয়াজিব কায়েমের প্রতিবন্ধক হয়, এটা বিপরীতমুখী একটি বিষয়। আর যুদ্ধের ফরজ বাতিল হবে না। এটা এই কথা প্রমাণিত করে যে, জরিমানা বাতিল হয়ে যাবে তবে পিপাসার্ত অবস্থা এর বিপরীত। কেননা জরিমানা ওয়াজিব হওয়াটা সেখানে পান করা বা ভোগ করা থেকে বাঁধা প্রদান করে না। কেননা যদি সে পানি

পান না করে, তাহলে সে মারা যাবে। এমনিভাবে তার উপর যা ওয়াজিব হয়েছে, সে তা অর্জন বা আদায় করতে পারবে। সুতরাং তার পান করতে কোন বাঁধা নেই। আর এটা বিপরীতমুখী হবে না।

আর কোন মুসলিমের জন্য উচিত নয় যে, সে কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে কোন কাফেরের সাহায্য কামনা করবে। কেননা তাদের গাদ্দারি বিশ্বাস করা যায়না। যেহেতু এই ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় শত্রুতার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে যদি মুসলিমগণ সাহায্য গ্রহণে অপরাগ হয়, তাহলে গ্রহণ করতে পারবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অধিক ভালো জানেন।

মুসলিমদের উচিত নয় এক কাফিরের বিরুদ্ধে আরেক কাফিরের সাহায্য কামনা করা। তবে যদি অপারগ হয় তবে সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

জামাতে ইসলামী'র ভাইদের জন্য দলীল

কওমি মাদ্রসার ভাইয়েরা সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, তারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আবার আহলে হাদীসের ভাইয়েরও সুস্পষ্ট করে বলেন যে, তারা হাদিস ছাড়া কোন মাযহাবের দলীল মানবেন না। কিন্তু জামাতে ইসলামীর ভাইয়েরা সুস্পষ্ট করে কখনও বলেন নি যে, তারা মাযহাব অনুসরণ করেন। আবার তারা মাযহাব মানা হারামও কখনো বলেন নাই। এই জন্য তাদের মাযহাবের কিতাব বা হাদীস কোনটা থেকেই দলীল দিয়ে খুব বেশী ফায়দা নেই। বরং সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর কথা জামাত শিবিরের কর্মীদের কাছে মাযহাবের ইমামদের কথার চেয়েও অধিক গ্রহণযোগ্য। তাই আমরা জামাতে ইসলামীর ভাইদের জন্য মাওলানা মওদূদী'র কিতাব থেকে দলীল দিব ইনশাল্লাহ। কেউ ভুল বুঝবেন না যে আমি বলছি জামাতের ভাইয়েরা কোরআন হাদীসের দলীল মানেন না। আমি বরং বলতে চাচ্ছি কওমী মাদ্রাসার ভাইদের কাছে ইমাম আবু হানিফার যে মর্যাদা জামাতের ভাইদের কাছে মাওলানা মওদূদীর সে মর্যাদা। জামাতের যেসমস্থ কর্মীবৃন্দ মওদুদীর দলীল গ্রহণ করবেন না, তাদের জন্য পরবর্তী অনুচ্ছেদে আহলে হাদীসের জন্য দেওয়া হাদীসের দলীল দ্রষ্টব্য।

জামাতের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবূল আ'লা মওদূদী রহঃ কোন একক মাযহাব অনুসরণ করতেন না যা তার লেখনী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। তাই বলে উনি মাযহাব মানাকে বাতিলও বলতেন না, বরং তিনি একেক বিষয়ের মাসআলা একেক

মাযহাব থেকে নিতেন। চার মাযহাবের বাহিরে গিয়ে উনি ফতোয়া দিয়েছেন এরকম খুবই কম। কিতাল সংক্রান্ত মাসআলা উনি হানাফী মাযহাব থেকে নিয়েছেন। তবে মাযহাবের বাহিরে গিয়েও কিছু দলীল দিয়েছেন। মাওলানা মওদূদী চব্বিশ বছর বয়সে আল জিহাদ গ্রন্থ রচনা করেন যেটাকে জামাতী ইসলামীর ভাইয়েরা বিগত শতাব্দীতে জিহাদের উপর রচিত যুগান্তকারী একটি কিতাব হিসাবে অভিহিত করেন। মজার বিষয় হচ্ছে এই কিতাবটি উনি রচনা করেছিলেন ইসলামের উপর সন্ত্রাসবাদীতার যে অভিযোগ দেওয়া হয় তার জবাব হিসাবে। ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ শুধু যে এযুগেই আছে তা নয়, বরং আজ থেকে প্রায় একশত বছর আগেও সেই একই অভিযোগ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দকে জনৈক মুসলিম ইসলামের নামে হত্যা করেছিল। ফলে তখন চারিদিকে রব উঠেছিল ইসলাম হচ্ছে সন্ত্রাসের ধর্ম, এর জন্ম ও বিস্তারই হয়েছে তরবারীর মাধ্যমে। মূলত এই অভিযোগের জবাব দিতেই মাওলানা মওদূদী তার 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' কিতাবখানা রচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি সামরিক বেসামরিক লোকের সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুত্র হিসাবে উনি চারটি কিতাবের উল্লেখ করেছেন- আল হিদায়া, বাদাউস সানায়ে ও ফাতহুল কাদীর, ফুতুহুল বুলদান। এর মধ্যে তিনটি কিতাবই হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য গ্রন্থ। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দুইটি কিতাবের সংশ্লিষ্ট অংশের উদ্ধৃতি দিয়েছি। আমরা কিতাবের ইবারতের ব্যাখ্যায় লিখেছি, যুদ্ধ সক্ষম সকল পুরুষ লোককে হত্যা করা জায়েজ কারণ তারা সবাই সামরিক লোক হিসাবে বিবেচিত। মাওলানা মওদূদীও একই কিতাব থেকে সামরিক বেসামরিক লোকের সংজ্ঞা দিয়েছেন। চলুন আমরা দেখি আমাদের সংজ্ঞা আর তার দেওয়ার সংজ্ঞার মধ্যে কোন অমিল পাওয়া যায় কিনা। মাওলানা মওদূদী আল জিহাদ কিতাবের ২৩১ প্রিষ্টায় লিখেন,

"যুদ্ধরতদের দুই শ্রেনিতে ভাগ করা হয়েছে। এক সামরিক লোকজন, দ্বীতিয় বেসামরিক লোকজন। সামরিক লোক হল যারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নেয় বা প্রচলিত রীতি অনুসারে বা সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির বিচারে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ যুবক পুরুষ।

আর যারা প্রচলিত রীতিনীতি বা সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির বিচারে যুদ্ধে অংশ নিতে পারে না বা সাধারণভাবে নেয় না। যেমন নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রোগী, আহত, অন্ধ, পঙ্গু, উন্মাদ, ধর্মীয় উপাসনালয়ের যাযক ও সেবক এবং এমনিধরনের অনিষ্টহীন

লোকজন। ইসলাম প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদের হত্যার অনুমতি দিয়েছে। দ্বীতিয় শ্রেণীর লোকদের হত্যার অনুমতি দেয় নি।

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রণাঙ্গনে এক মহিলার লাস দেখতে পেলেন। তিনি রুষ্ট হয়ে বললেন, 'এই মহিলাতো যুদ্ধকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' অতঃপর সেনাপতি খালেদ রহঃকে বলে পাঠালেন, 'কোন মহিলা কিংবা মজুরকে হত্যা কর না।' অন্য এক বর্ণনায় জানা যায় যে, এ ঘটনার পর হযরত মহিলা ও শিশুদের হত্যা সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ করে দেন।

এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'কোন বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের হত্যা করো না। গনিমতের মাল অপহরণ করো না।

যুদ্ধে যা কিছু হস্তগত হয় একত্র কর। ভাল কাজ ও ভাল ব্যবহার কর। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।'

মক্কা বিজয়ের সময় তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন যে, কোন আহত ব্যাক্তির উপর হামলা করা চলবে না, প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছে কোন ব্যাক্তির পিছু ধাওয়া করা চলবে না এবং যে ব্যাক্তি দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকে কিছু বলা যাবে না। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বর্ণনা করেন যে, হযরত কোথাও সৈন্য প্রেরণের সময় উপাসনালয়ের নীরিহ সেবকদের ও আশ্রমের সাধক সন্ন্যাসীদের হত্যা করতে নিষেধ করে দিতেন।

এই সব খুটিনাটি বর্ননা থেকে মুসলিম ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ এই মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে সব লোক যুদ্ধ করতে অক্ষম সচারচর অক্ষম বলেই বিবেচিত হয়ে থাকেন, তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ করা বৈধ নয়, অবশ্য এ ব্যবস্থাটা শর্তহীন নয়। তারা যদি সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ না নেই তবেই এই ব্যবস্থা। তাদের কেউ যদি সামরিক তৎপরতায় সত্যি সত্যিই শামিল হয় যেমন রুগ্ন ব্যাক্তি খাটের উপর শুয়ে শুয়ে যুদ্ধের কলা কৌশল শিখিয়ে দিতে থাকে। নারী শত্রুর গুপচর বৃত্তিতে লিপ্ত হয়, শিশু গোপন তথ্য আদান প্রদান করে, অথবা ধর্মীয় আশ্রম বা উপাসনালয়ের লোকেরা তার জাতির মধ্যে যুদ্ধের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তাহলে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে। কেননা সে নিজেই সামরিক লোকদের সাথে যোগ দিয়ে নিজেকে সামরিক লোকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী

আইনের সার কথা হল, সামরিক লোকদের হত্যা করা যাবে—চাই তারা সক্রিয় ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাক বা না থাক। আর বেসামরিক লোকদের কেবল তখনই হত্যা করা যাবে যখন তারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে কিংবা সক্রিয় যোদ্ধাদেরই শোভা পায় এমন ততপরতা চালায়।”

(হানাফী মাযহাবের দেওয়া সামরিক লোকের সংজ্ঞার সাথে মাওলানা মওদুদীর তেমন কোন মতবিরোধ নেই। উনি একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যেটা হানাফী মাযহাবের কিতাবে নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মজুরদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আবার উনি বলেছেন ধর্মীয় উপাসনালয়ের যাযক ও সেবক বেসামরিক লোক। কিন্তু আমরা হানাফী মাযহাবের কিতাবে দেখেছি তারা যাজক ও সেবককে সামরিক লোক হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছেন। কেউ কেউ কিয়াস করতে পারেন যে, মজুর হত্যা যদি নিষিদ্ধ হয় তবে সকল যুবক পুরুষ কি করে সামরিক লোক হতে পারে। সকল মজুরই তো যুবক লোক। কেউ আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলতে পারেন যে, মজুরের মত বর্তমান যুগের সকল চাকরিজীবীও বেসামরিক লোক। কারণ চাকরীজীবিরাও তো এক ধরণের মজুর। তারা ছিল দিন মজুর আর চাকরিজীবীরা হচ্ছে মাসিক মজুর! হাদীসের বিষয়ে এই অনুচ্ছেদে কোন ব্যাখ্যা দিতে আমি আগ্রহী নয়, হাদিস সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ‘আহলে হাদিসের ভাইদের জন্য দলীল’ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। আমি শুধু বলতে চাই মাওলানা মওদুদী সকল যুবক পুরুষকে সামরিক লোক বলেছেন। এবং উপসংহারেও বলেছেন, এই সব খুটিনাটি বর্ননা থেকে মুসলিম ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ এই মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে সব লোক যুদ্ধ করতে অক্ষম সচারচর অক্ষম বলেই বিবেচিত হয়ে থাকেন, তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ করা বৈধ নয়। অর্থাৎ মওদুদির মতে শারিরিক সক্ষমতাই সামরিক বেসামরিক নির্ধারক, কারও যুদ্ধে ভূমিকা বা তার ব্যাক্তিগত পেশা নয়।)

আহলে হাদীসের ভাইদের জন্য দলীল

ক্বিতাল সংক্রান্ত যতগুলো আয়াত হাদীস আছে তার সবগুলোই এখানে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আহলে হাদীসের ভাইদের উদ্দেশ্যে নসীয়াহ হচ্ছে আপনারা একটি বা দুইটি আয়াত হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করবেন না। যেকোন বিষয়ে

চূড়ান্ত সীদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য সে বিষয়ের যত হাদীস ও আয়াত আছে তার সবগুলোই বিবেচনায় নিতে হবে।

১.

যারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনে না, এবং কিয়ামত দিবসের প্রতিও না আর ওই বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না যেঁগুলোকে আল্লাহ্* ও তার রাসুল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যে পর্যন্ত না তারা করজোড়ে জিজিয়া দিতে সম্মত হয়। সুরাহ আত তাওবাহ- ২৯।

এই আয়াতে সকল ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা জিজিয়া দিতে সম্মত হয়। এখানে খেয়াল করুন এই চরমপত্র সকল ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের জন্যই প্রযোজ্য, শুধু খ্রিষ্টান শাসক ও তার সেনাবাহিনীর জন্য নয়। এখানে যে অপরাধের কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সে অপরাধে দোষী সাব্যস্ত সকল ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান। আর সে অপরাধ হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা হারাম করেছেন তারা তা হারাম করে না এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না।

এখন যদি কাফির সম্প্রদায় যুদ্ধ না করে জিজিয়া দিতে সম্মত হয় তবে তবে তাদের রক্তপাত হারাম হয়ে যায়। নতুবা তাদের অস্ত্র বহনে সক্ষম যেকোন পুরুষকে মুসলিমদের জন্য যুদ্ধে বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত হত্যা করা বৈধ। অতএব এখান থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, যুদ্ধ সক্ষম সকল কাফিরের বিরুদ্ধেই ইসলাম যুদ্ধ করতে বলে। কার হাতে অস্ত্র আছে আর কার হাতে অস্ত্র নেই তার উপর ভিত্তি করে নয়, বরং একজন নিরস্ত্র ইহুদী যুবক জিজিয়া দিতে অস্বীকার করলে তাকেও হত্যা করা জায়েজ হবে।

২.

আল্লাহু সুবহানাহু তায়ালা বলেন, ‘অতএব যখন নিষিদ্ধ মাসগুল অতীত হয়ে যায় ওই মুশরিকদের যেখানে পাও বধ কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখ, ঘাটিস্থল সমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর, অতঃপর যদি তারা তওবাহ করে নেয়, সালাত আদায় করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও নিশ্চয়ই আল্লাহ্* অতিশয় ক্ষমাপরায়ন, পরম করুণাময়য়।’ সুরাহ তওবাহ, ৫

এই আয়াত দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে, এখানে বলা হয় নাই যে সমস্ত মুশরিক অস্ত্র হাতে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শুধু তাদেরকে হত্যা কর, বরং ওঁত পেতে থাকতে হবে, যে মুশরিককেই পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করা হবে। নিশ্চয়ই মুশরিক সম্প্রদায়ের সকল সদস্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতাভাবাপন্ন ছিল না, কিছু খেটে খাওয়া নিরীহ মুশরিক অবশ্যই সেসময় মক্কাতে ছিল। সকল মুশরিক মুসলিমদের সাথে করা চুক্তি ভঙ্গ করে নাই কিন্তু শাস্তি সবার উপরেই অর্পিত হয়েছিল। সুতরাং যুদ্ধরত মুশরিক সম্প্রদায়ের সকল সক্ষম পুরুষই কা'তলের উপযুক্ত।

৩.

"এ কারণেই, আমি বনী ইসরাঈলের উপর এই হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল।" সূরাহ মায়েদাহ ৩২

বারাক ওবামাও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দলিল দিতে গিয়ে এই আয়াত ব্যবহার করেছে। জিহাদ ক্বিতাল বিরোধীদের সবচেয়ে পছন্দের আয়াত এটি। যুদ্ধের প্রয়োজন ব্যাতিরেকেই কোন কাফিরকে খেল তামাশার জন্য হত্যা করলে এই আয়াত প্রয়োগ করা যেতে পারে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় যুদ্ধের প্রয়োজন ব্যাতিরেকে কোন কাফিরকে হত্যা করেছেন এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত জাতির শুধু অস্ত্র ধারীদেরই হত্যা করতে হবে এমন টা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনে সংগঠিত যুদ্ধে পাওয়া যায় না। যেমন বনু কোরায়যার সকল বালেগ পুরুষ সদস্যকেই হত্যা করা হয়েছিল। সাধারণত একটা গোত্রের সকল সদস্যই যুদ্ধে লিপ্ত থাকে না। বনু কোরায়যার পক্ষ থেকে যে গাদ্দারী বা চুক্তিভঙ্গ করা হয়েছিল তার সঙ্গে সে গোত্রের শুধু নেতৃ স্থানীয়রাই জড়িত ছিল। কিন্তু শাস্তি সবাইকে পেতে হয়েছিল। একজন মানুষকে হত্যা করলে যদি সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করা হয় তবে রাসুল সা ছয় শত ইহুদিকে হত্যার মাধ্যমে কত গুলো মানব জাতিকে হত্যা করেছিলেন? রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন হচ্ছে জীবন্ত কোরআন। সুতরাং উনার জীবন হচ্ছে কোরআনের ব্যাখ্যা। তাই আমরা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতে

পারি যুদ্ধরত জাতির কোন সদস্যকে হত্যার ক্ষেত্রে এই আয়াত প্রযোজ্য নয়। খেয়াল করুন, বর্তমানে আল কায়দা বা আইএস কিন্তু ব্রাজিল বা পাপুয়া নিউগিনির মত রাষ্ট্রের কাফির হত্যা করছে না, তারা শুধুমাত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফির দেশেরই নাগরিকদের হত্যা করছে।

৪.

সুলায়মান ইবনে বুরায়দা তার পিতা থেকে বর্ননা করে যে, যখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন বাহিনী প্রেরণ করতেন তখন তার আমীরকে নির্দেশনা দিতেন, ... যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাদেরকে জিজিয়া দিতে আহ্বান জানাও, এবং তারা যদি তাতে সম্মত হয় তবে তাদের থেকে জিজিয়া গ্রহণ করুন এবং তাদের পথ ছেরে দিন। মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ

অতএব ইসলামের অনুসারি (দ্বীন কবুল) বা অনুগামী (জিজিয়া প্রদান) কোনটাই হতে সম্মত না হলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশনা দিতেন।

৫.

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا»

অর্থঃ আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, যখন তারা ইহা বলে ফেলবে, তখন তাদের রক্ত ও মাল আমার থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে, তবে শরীয়তের কোন হক নয়। (বুখারী, মুসলিম)

যতক্ষন পর্যন্ত কেউ কালিমা পাঠ করবে না ততক্ষন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। খুবই সহয ও সরল বাক্য, কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দরকার নেই। আর যদি কারও ব্যাখ্যা নিতেই হয় তবে মাযহাবের ইমাম যারা তাবেঈ বা তাবে তাবেঈ ছিলেন তাদেরই ব্যাখ্যা নেওয়া উচিত, বর্তমান যুগের কোন গ্র্যান্ড বা স্ট্রিট মুফতির নয়।

আমরা উপরে হানাফী মাযহাবের ফিক্বহ তুলে ধরেছি, অন্যরা চাইলে শাফেয়ী ফিক্বহ পড়ে দেখতে পারেন।

৬.

জয়নাব ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত, উমর ইবনে খাত্তাব রাঃ নির্দেশ দিয়েছেন, গণিমত চুরি করো না, শত্রুর সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করো না, লাস বিকৃত করো না, শিশুদের হত্যা করো না, এবং আল্লাহকে ভয় কর সমস্ত কৃষকের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় না। (সুনান সাইদ ইবনে মানসুর)

খালিদ বিন সায়িদ রাঃ শামের অভিযানের সময় ত্রিশ জন কৃষককে হত্যা করেন এবং চারজনকে বন্দী করেন। হত্যার আগে উনি জানতেন না তারা কৃষক না বিজ্ঞানী। খালিদ বিন সায়িদ রা ও তার সহযোগীরা শুধু জানতে যে তারা খ্রিষ্টান। তাদের চার জনকে বন্দী করলে পরে তিনি জানতে পারেন যে, তারা কৃষক হত্যা করেছেন। তবে এই জন্য তাদের অনুতপ্ত হতে দেখা যায় নি। বরং বন্দী চার জন ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করলে তাদের কেও হত্যা করতে উদ্যত হন তিনি। অবশ্য পরবর্তীতে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় এই শর্তে যে তারা মুসলিমদের রোমান বাহীনির অবস্থান চিহ্নিত করে দিবে। আল্লামা ইমাম ওয়াক্বেদী রহঃ ফুতুহুশ শাম, বাংলায় মরণজয়ী সাহাবা, ৬৮ প্রিষ্টা

এই ঘটনা হযরত আবু বকর রাঃ এর খিলাফতকালীন। অর্থাৎ তখন সাহাব্যে কেরাম কৃষকদের বেসামরিক গন্য করতেন না। পরবর্তীতে উমর রাঃ কৃষক হত্যা নিষেধ করেন। আহলে হাদীসের ভাইয়েরা উমরের নিষেধাজ্ঞা মানেন না যদি তা প্রথম যুগের প্রচলিত বিধানের বিপরীত হয়। যেমন উমর রাঃ এর শাসনের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত একসঙ্গে তিন তালাককে এক তালাক গন্য করা হত। পরবর্তীতে উমর রাঃ তিন তালাক এক সাথে দিলেও তিন তালাক হবে বলে রায় দেন। কিন্তু আহলে হাদিসের ভাইয়েরা তিন তালাককে এক তালাক মনে করেন। কারন তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও উমর রাঃ এর মধ্যে ভিন্ন মত দেখলে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণ করতে চান। একইভাবে তারা উমর রাঃ এর প্রবর্তিত বিশ রাকআত তারাবীহ নামায পড়তে রাজী নয়, কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আট রাকআত পড়তেন।

কৃষক হত্যার খেত্রেও বুঝা যাচ্ছে উমর রাঃ এই বিধান চালু করার আগে কৃষকদের সাহাবায়ে কেরাম বেসামরিক লোক গন্য করতেন না। এখেত্রেও পরস্পর বিপরীতধর্মী হাদিস পাওয়া যাচ্ছে। এই বিবাদের সমাধানের জন্য আমাদের সলফে সলেহীনের দ্বারস্থ হওয়া উচিত। মাযহাবের ইমামরা যেহেতু সলফে সালেহীনের অন্তর্ভুক্ত, তাই তাদের মতামত এখানে বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী কৃষকদের বেসামরিক লোক গন্য করতেন না।

৭.

আশ্রমের সন্ন্যাসীদের হত্যা কর না, এবং ওই সব লোক যারা ইবাদত খানায় (নির্জনবাস করছে)। মুসনাদে আহমাদ

আবু বক্কর রাঃ বলেন, অন্যায় অবিচারি সম্প্রদায় শত্রুর উপর বিজয় লাভ করতে পারে না। কিশোর বৃদ্ধ মহিলা শিশুদের হত্যা করবে না। তাদের ক্ষেতকে পড়ে ফেলবে না, ফলবান বৃক্ষ কাটবে না। সেখানে এমন কিছু দরবেশ দেখতে পাবে যারা তাদের ইবাদাত খানায় নির্জনবাস করছে এবং মনে করছে যে তাদের এই নির্জনবাস একমাত্র আল্লাহর জন্য। অতএব তাদের কোন ক্ষতি করবে না, এবং তাদের ইবাদাত খানা ধবংশ করবে না। আর তোমরা এমন কিছু লোককে দেখতে পাবে যারা শয়তানের দলের অনুসারী এবং ক্রুশের অনুসারী। তারা মাঝখান থেকে মাথা মন্ডিয়ে রাখে যেন তা হাড়ের উপরের মোটা গোস্ত । ইসলাম গ্রহণ বা অপদস্ত হয়ে জিজিয়া না দিলে তাদের উপর চড়াও হবে। আল্লামা ইমাম ওয়াক্বেদী রহঃ, ফুতুহুশ শাম, বাংলায় মরণজয়ী সাহাবা

ব্র্যাকেটে নির্জনবাস শব্দটা আমার দেওয়া। কারণ পরবর্তী হাদীসে নির্জনবাস শব্দটা আছে। কেউ কেউ উপাসনালয়ের পুরোহিত বা যাজকদের ইবাদতখানার অধিবাসী মনে করতে পারেন। কিন্তু হাদীসে পুরোহিত বা যাজক শব্দটা উল্লেখ নেই। মূলত সন্ন্যাসী বা দরবেশদের কথা এখানে বলা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের রায়েও আমরা দেখেছি জাযকদের সামরিক লোক বলা হয়েছে।

৮.

রাবাহ ইবনে আরাবীহ থেকে বর্ণিত, আমরা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে একটা যুদ্ধে ছিলাম, এবং তিনি ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম)) দেখলেন লোকেরা এক জায়গায় জটলা করেছে। তিনি একজনকে পাঠালেন এবং বললেন, দেখ, এরা কেন জমায়েত হয়েছে? লোকটি ফিরে আসল এবং বলল, তারা একজন মহিলার চারপাশে একত্রিত হয়েছে যে মহিলাটিকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বললেন, তারা তো যুদ্ধে জড়িত হতে পারে না। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ একটি অগ্রবর্তী বাহীনির দায়িত্বে ছিল, সুতরাং তিনি একজন লোককে পাঠালেন খালিদকে বলার জন্য, খালিদকে বল, কোন মহিলা বা মজুরকে হত্যা না করতে। মুসানাদে আহমাদ ১৫৯৯২, আবু দাউদ ২৬৬৯

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মজুর হত্যা নিষেধ করেছেন। মজুর বলতে সেই সব শ্রমিকদের বোঝায় যাদেরকে দৈনিক মজুরীর বিনিময়ে কাজে নিয়োযিত করা হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মজুর হত্যা নিষেধ করেছেন কিন্তু হানাফী মাযহাবে বেসামরিক লোকের তালিকায় মজুরের কোন উল্লেখ নেই। এই হাদীস কি হানাফী মযহাবের ইমামদের কাছে পৌছায় নি নাকি তারা এই হাদীসকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই, সে বিষয়ে হানাফী উলামায়ে কেরাম ভাল বলতে পারবেন।

আহলে হাদীসের ভাইয়েরা অবশ্যই এখান থেকে দলিল নিতে পারেন যে মজুররা বেসামরিক নাগরিকের অন্তর্ভুক্ত।

কেউ যদি কিয়াস করেন যে মজুররা যুদ্ধ করে না তাই তারা বেসামরিক হলে অন্য যারা যুদ্ধ করে না তারা কেন বেসামরিক হবে না? যেমন ডাক্তার, ট্যাক্সি চালক, ভিক্ষুক, বাবুর্চী ইত্যাদি পেশার মানুষও তো যুদ্ধ করে না। তাই তারাও মজুরের মত বেসামরিক লোক হবেন। এরকম কিয়াসের জবাব হচ্ছে, আপনার ইজতিহাদ করার অধিকার আছে যেমন তেমনি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেঈ এরও ইজতিহাদ করার অধিকার আছে। আপনি চাইলে আপনার ইজতিহাদের উপর আমল করতে পারেন, তবে আপনি কোনভাবেই মাযহাবের ইমামদের ইজতিহাদ কেউ অনুসরণ করলে তাকে সন্ত্রাসী বা বিপথগামী বলতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, একক হাদীসের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত সীদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। যদি আপনি এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত রায় দেন, তবে মুযাহিদনরাও চাইলে বনু কোরায়যার হাদীসের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত রায় দিতে পারে। মজুর হত্যার হাদীসের উপর ভিত্তি করে আপনি যেমন বলতে পারেন ডাক্তার, ড্রাইভার, পাচক ইত্যাদি পেশার লোকও

বেসামরিক নাগরিক, তেমনি মুযাহিদিনরাও বনু কুরায়যার হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলতে পারে যুদ্ধরত গোত্র বা জাতির সকল বালেগ পুরুষ সদস্যই সামরিক লোক। পরস্পর বিপরীত মুখী দুই হাদিসের ক্ষেত্রে প্রয়োজন সমন্বয় সাধনের। সলফে সালেহীনরা এই ক্ষেত্রে কি মতামত দিয়েছেন সেটাই আমাদের সকলের গ্রহণ করা উচিত। সলফে সালেহীন বলতে সাহাবায়ে আজমাইন, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈন – এই তিন প্রজন্ম কে বুঝায়। চার মাযহাবের ইমামই সে অনুসারে সলফে সলেহীনদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেঈ মজুরদের বেসামরিক লোকের তালিকাভুক্ত করেন নি। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ করেছেন এরকম কারো জানা থাকলে জানাবেন দয়া করে।

৯.

বনি নজির গোত্র উচ্ছেদ

হিজরী চতুর্থ সনে ইহুদি বনি নজীর গোত্রের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবী রাজিয়াল্লাহু আনহুমকে সঙ্গে নিয়ে ইহুদীদের নিকট গমন করে বনি কিলাব গোত্রের সেই দুই ব্যাক্তি'র শোনিতপাতের খেসারত সম্পর্কে কথপকোথন করছিলেন, 'আমীর বিন উমাইয়া যামরী' ভুলক্রমে যাদের হত্যা করেছিলেন। তাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির কারণে এ ব্যাপারে সসহয়তা করা ছিল আশু কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের সাথে কথোপকথনরত ছিলেন তখন তারা বলল, 'আবুল কাশেম! আমরা আপনার কথা মতই কাজ করব। আপনি এখানে অবস্থান করুন, আমরা আপনার প্রয়োজন পুরণ করছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের এক বাড়ির দেয়ালে গা লাগিয়ে বসে পড়লেন এবং তাদের ওয়াদা পূরণের অপেক্ষায় রইলেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন আবু বকর রাঃ, উমর রাঃ, আলী রাঃ এবং আরও কয়েক সাহাবায়ে কেরামের দল।

একদিকে ইহুদীগণ গোপনে অকত্রিত হলে শয়তান তাদের পেয়ে বসল এবং তাদের ভাগ্য লিখনে যে দুর্ভাগ্যের প্রসঙ্গটি লিপি বদ্ধ হয়েছিল সে তাকে আরও

সুশোভন করে উপস্থাপন করল। এ প্রেক্ষিতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হত্যার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পারস্পারিক বলাবলি শুরু করল, 'কে এমন আছে যে, এই চাকীটা নিয়ে দেওয়ালের উপর উঠে যাবে অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাথার উপর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করবে?' দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাস বলল, 'আমি।'

তাদের মধ্য থেকে সাল্লাম বিন মিশকাম বলল, 'তোমরা এমন করো না, কারণ আল্লাহর কসম! তোমরা যা করতে চাচ্ছ সে সম্পর্কে তাকে অবগত করিয়ে দেওয়া হবে। অধিকন্তু, তাদের এবং আমাদের মাঝে যে অঙ্গীকারনামা আছে, এ কাজ হবে তারও বিপরীত।'

কিন্তু তার কথায় কর্নপাত না করে তাদের চক্রান্তমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ব্যাপারে অটল রইল। এদিকে মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে জীবরাইল আঃ আগমন করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ইহুদী চক্রান্ত অবহিত করে দিলেন। তিনি সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করে মদীনা অভুমুখে রওনা হয়ে গেলেন। পরে সাহাবাবৃন্দ এসে তার সঙ্গে এসে মিলিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ'র রাসুল! আপনি সেখান থেকে চলে এলেন কিন্তু আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন ইহুদী চক্রান্তের বিষয়টি তাদের নিকট ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ইহুদীগণ এক ভয়ঙ্কর চক্রান্ত করেছিল যা আল্লাহ্* তায়ালা আমাকে অবগত করেছেন।'

মদীনা প্রত্যাবর্তনের পরপরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বনী নজীরের নিকট এ নির্দেশসহ প্রেরণ করলেন যে, তারা যেন অবিলম্বে মদীনা থেকে বেরিয়ে অন্যত্র চলে যায়। মুসলিমগণের সাথে তারা আর বসবাস করতে পারবে না। মদীনা পরিত্যাগ করে যাওয়ার জন্য তাদের দশ দিন সময় দেওয়া হল। এ নির্ধারিত সময়ের প যাকে মদীনায় পাওয়া যাবে তার গ্রীবা কর্তন করা হবে। (ইবনে ইসহাক)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল মাত্র 'গুটিকয়েক' ইহুদি এবং বনি নজীর গোত্রের অবশিষ্ট ইহুদিরারাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র যে করা হয়েছে সে বিষয়েই অবগত ছিল

না, পরামর্শ বা অংশগ্রহণ তো অনেক পরের কথা! অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ ঘোষণা করলেন সমগ্র বনি নজীর গোত্রের বিরুদ্ধে। এখান থেকে আহলে হাদীসের ভাইয়েরা মাসআলা নিতে পারেন, কয়েকজন গোত্রপতির অপরাধের কারণে গোত্রের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। সুতরাং বারাক ওবামা বা জর্জ বুশের অপরাধের কারণে বর্তমানে আমেরিকার সকল অধিবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে।

১০.

বনু কুরায়জার ঘটনা

বনু কুরায়জা মদিনার একটি ইহুদী গোত্র ছিল। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মদীনায় আসেন তখন তিনি অন্য সব গোত্রের ন্যায় বনু কুরায়জা'র সাথেও চুক্তি করেন। বনু নাজির গোত্রের সঙ্গে যখন যুদ্ধ হয় তবে তখন তিনি বনু কুরায়যা'র সাথে চুক্তি নিবায়ন করেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় মুসলিমদের দুই পাশে ছিল পর্বত আর সামনে ছিল কুরাইশ ও তাদের মিত্র বাহিনী। বনু কুরায়যার অবস্থান ছিল মুসলিমদের পেছনে। যেহেতু রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বনি কুরায়যার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন তাই তিনি সেদিকটা অরক্ষিত রেখেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের এই নাযুক মুহূর্তে বনু কুরায়যা চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং মুসলিমদের শত্রু বাহিনীকে যুদ্ধে সহযোগিতা করে। উপরন্তু মুসলিম নারী ও শিশুদের যে দুর্গে সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন তার নিকটে বনু কুরায়যার অবস্থান ছিল। যুদ্ধে ময়দানে যখন সকল পুরুষ অবস্থান করছিলেন তখন বনু কুরায়যার এই বিশ্বাসঘাতকতা মুসলিম নারীদের জীবন ও সম্ভ্রম হুমকির মুখে পড়েছিল। এমতবস্থায় যুদ্ধে ছেড়ে আসাও সম্ভব ছিল না। খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহ্* যখন স্বীয় অনুগ্রহে মুসলিমদের বিজয় সান করেন তখন ফেরেশতা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ম খুলে ফেলতে নিষেধ করেন এবং বনু কুরায়যা আক্রমণ করতে নির্দেশ দেন। ২৫ দিন অবরোধ করা রাখার পরে বনু কুরায়া আত্মসমর্পন করে। সাদ বিন মুয়াযের ফায়সালা মেনে নিতে উভয় পক্ষই রাজি হয়। সাদ রাঃ বনু কুরায়যার সকল সাবালক পুরুষ সদস্যকে হত্যা করতে নির্দেশ দেন এবং নারী ও শিশুদের বন্দি করতে ফায়সালা দেন। যে সমস্ত বালকের নাভির নিম্ন দেশে পশম

গজিয়েছিল তাদের সকলকে শিরচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। (আররাহিকুল মাখতুম)

এখান থেকে ফায়সালা পাওয়া যায় ইসলামী আইনে যুদ্ধরত কাফির সম্প্রদায়ের সকল পুরুষ হত্যার যোগ্য। যুদ্ধে বিজয়ের পরে যদি এই হয় ফায়সালা তবে যুদ্ধের মাঝখানে কি করে তার ভিন্ন বিধান হতে পারে? যুদ্ধের পরে যাচাই বাছাই করার অনেক সুযোগ থাকে, কে অস্ত্র বহন করেছে আর কে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র সংবরণ করেছে। কিন্তু যুদ্ধের মাঝ পথে এটা খুবই কঠিন, অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। তাই যুদ্ধরত অবস্থায় কাফির সম্প্রদায়ের সকল যুবককে যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু বানানো শরিয়াহ আইনে জায়েজ।

১১.

আবু বাসির রাঃ এর ঘটনা

হুদায়বিয়া'র সন্ধি অনুসারে কোন মুশরিক মুসলিম হয়ে মক্কায় আসলে তাকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুশরিকদের কাছে ফেরত পাঠাতে বাধ্য ছিলেন। হযরত আবু বাসির রাঃ ইসলাম কবুল করে কোন রকমে মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় চলে আসে। তিনি সাক্বিফ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত আর সাকিফ গোত্র কুরাইশদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। তাই তাকে ফেরত নেওয়ার জন্য কুরাইশরা দুইজনকে মদীনায় প্রেরণ করে। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে চুক্তি মোতাবেক তাকে ফেরত দেওয়ার দাবি জানাল। তাদের একথার প্রেক্ষিতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বাসিরকে তাদের হাতে সমর্পণ করে দিলেন। তারা দুজনে তাকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা অভুমুখে যাত্রা করল। পথ চলার এক পর্যায়ে তারা জুল হুলায়ফা নামক স্থানে অবতরণ করে খেজুর খেতে লাগল। খাওয়া দাওয়া চলাকালীন এবু বাসির একজনকে বলল, ওগো ভাই! আল্লাহ'র শপথ! তোমার তরবারীখানা আমার নিকট খুবই উৎকৃষ্ট মনে হচ্ছে। সে ব্যাক্তি কোষ থেকে তরবারী খানা বের করে নিয়ে বলল, ' হ্যা, হ্যা, আল্লাহ'র শপথ! এ হচ্ছে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট তরবারী। আমি একে বার বার পরীক্ষা করে দেখেছি।
আবু বাসির রাঃ বলল, 'তরবারীখানা আমার হাতে একবার দাও ভাই, আমিও দেখি।'

সে তার কথা মত তরবারিখানা তার হাতে দিল। এদিকে তরবারি হাতে পাওয়া মাত্রই আবু বাসির তাকে আক্রমণ করে স্তূপে পরিণত করে দিল।

দ্বিতীয় ব্যাক্তি প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে মদীনায় এসে উপস্থিত হল এবং দৌড় দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করল। রাসুলুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখে বললেন, 'কি হয়েছে, একে এত ভীত দেখাচ্ছে কেন?'

লোকটি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অগ্রসর হয়ে বলল, 'আল্লাহ'র শপথ আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমাকেও হত্যা করা হবে।' এ সময় আবু বাসীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং বলল, 'হে আল্লাহ'র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আল্লাহ্* আপনার অঙ্গীকার পুরণ করে দিয়েছেন। আপনি আমাকে তাদের হস্তে সম্পর্পণ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ্* আমাকে তাদের নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন।'
রাসুলূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তার মাতা ধ্বংস হোক এ কোন সঙ্গী পেলে যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করবে।'

নবী কারিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ কথা শুনে আবু বাসির রাঃ বুঝে নিলেন যে, পুনরায় তাকে কাফিরদের হস্তেই সমর্পণ করা হবে। কাজেই, কাল বিলম্ব না করে তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে উপকূলীয় এলাকা অভূমুখে অগ্রসর হলেন। এ দিকে আবু জান্দাল বিন সুহাইলও কোনভাবে মক্কা থেকে পলায়ন করেন এবং আবু বাসীরের সাথে মিলিত হন। এরপর থেকে কুরাইশদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে মক্কা থেকে পলায়ন করে গিয়ে আবু বাসিরের সঙ্গে মিলিত হতেন। এভাবে একত্রিত হয়ে তারা একটি সুসংগঠিত দলে পরিণত হয়ে যান। এরপর থেকে সিরিয়া থেকে আগমনকারী কুরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফেলার খোজ খবর পেলেই তারা তদের উপর চড়াও হয়ে লোকজনকে মারধর করতেন এবং ধনমাল যা পেতেন লুটপাট করে নিতেন। বার বার প্রহৃত ও লুণ্ঠিত হওয়া ফলে ত্যাক্ত বিরক্ত হয়ে অবশেষে কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অনুরোধ করলেন, তিনি যেন তাদের তার নিয়ন্ত্রাধীনে নিয়ে নেন। এ প্রেক্ষিতে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বাসির কে

চিঠি লিখলেন, হে আবু বাসির! তুমি ফিরে এসো। কিন্তু তিনি তখন মৃত্যু শয্যায়, তিনি সে চিঠি পাঠ করার পরেই পরলোকগমন করেন।

উক্ত ঘটনা থেকে দুটি মাসায়ালা পাওয়ায় যায়ঃ

এক, মুসলিমদের যদি একাধিক জামাহ থাকে তবে যে জামাহ'র সাথে কাফিররা চুক্তিবদ্ধ থাকবে উক্ত জামাহ'র অন্তর্ভুক্ত নয় এমন জামাহ'র জন্য সে চুক্তি প্রযোজ্য নয়। কারণ উক্ত ঘটনা অনুসারে আবু বাসির রাঃ মুসলিম জামাহ'র সাথে চুক্তিবদ্ধ একজন কাফিরকে হত্যা করেছে। কিন্তু এ জন্য তার উপর কিসাস প্রয়োগ করা হয় নি। কারন তিনি সে চুক্তির আওতাবহির্ভূত। ঠিক একই রকমে, বর্তমানে যদি সৌদি আরবের সাথে আমেরিকার চুক্তি থাকে সে চুক্তি আফগানিস্থানের তালিবানের উপর প্রযোজ্য নয়(সৌদি আরব যদি দারুল কুফর হয় তবে তা এমনিতেও প্রযোজ্য নয়। কিন্তু দারুল ইসলাম হলেও তালিবানের উপর সে চুক্তি মেনে চলা ফরয নয়)। তালিবানরা চাইলে যে কোন আমেরিকান কে পৃথিবীর যেকোন জায়গায় হত্যা করতে পারবে।

গুলশান হামলায় নিহত ব্যাক্তিবর্গ যদি কোন মুসলিম ব্যাক্তি বা মুসলিম রাষ্ট্র দ্বারা আমান প্রাপ্ত হয় সে নিরাপত্তা চুক্তি আল কায়দা বা আইএস মানতে শরিয়ায়হ'র আলোকে বাধ্য নয়। কারণ আইএসের সাথে ইতালি বা জাপান যুদ্ধরত। এক জামাহ'র চুক্তি আরেক জামাহ মানতে বাধ্য থাকে না। তবে খিলাফাহ রাষ্ট্রের অধীনে একজন মুসলিম কোন কাফিরকে আমান দিলে সেটা ঐ খিলাফাহ রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল মুসলিমের উপর তা মেনে চলা ফরজ, খিলাফহ'র বাহিরে বসবাসকারীদের উপর ফরজ নয়।

দুই, যুদ্ধরত কাফের জাতির নাগরিক ব্যবসার জন্য বের হলেও তাকে হত্যা করা যাবে। গুলশান অভিযানে কিছু 'নিরীহ' গার্মেন্টস ব্যবসায়ী নিহত হয়েছিল, অনেকে বলেছেন তারা তো আর যুদ্ধে করতে আসে নাই। কিন্তু উপরিউক্ত দলীল অনুসারে মুহারিব কাফির সে ব্যবসায়ী হলেও তাকে হত্যা করা যাবে যেমনটা আবু বাসির রাঃ সিরিয়া থেকে আগত কুরাইশদের 'নিরীহ' ব্যবসায়ীদের উপর হামলা করত।

১২.

তায়েফ অবরোধ

হিজরি অষ্টম সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তায়েফ শহর অবরোধ করেন। প্রকৃতপক্ষে তায়েফ যুদ্ধ ছিল হুনাইন যুদ্ধেরই বিস্তরণ। যেহেতু হাওয়াযিন ও সাক্বিফ গোত্রের ব্যাপক সংখ্যক পরাজিত সৈন্য তায়িফে গিয়েছিল এবং সেখানে দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছিল, সেহতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হুনাইন যুদ্ধের ব্যস্ততার পর তায়েফে সেনা প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তায়েফ শহর অবরোধ করেন এবং আনাস বিন মালিক রাঃ হতে বর্নিত মুসলিম শরীফের হাদিসে বলা হয়েছে এই অবরোধ চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তায়েফবাসির উপর মিনজানিক নামক যন্ত্র ব্যবহার করে গোলা নিক্ষেপ করেন। দীর্ঘসময় অবরোধ চলার পরেও দুর্গ আয়ত্বে আসার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না, অথচ ক্রমাগত মুসলিমদের উপর তীর ও উত্তপ্ত লোহার গোলা আসতে লাগল। উপরন্ত দুর্গবাসীগন এক বছরের জন্য খাদ্য ও পানীয় মজুদ করে রেখেছিল। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নওফাল বিন মুয়াবিয়ার পরামর্শে অবরোধ সমাপ্ত করলেন এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

এ ঘটনা থেকে কিছু দলীল পাওয়া যায়ঃ

এক, অবরোধ এমন একটা যুদ্ধ প্রক্রিয়া যা অবরুদ্ধ সকল অধিবাসীকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতএব এমন কোন যুদ্ধ কৌশল গ্রহণ করা জায়েজ যা সামরিক ও বেসামরিক সকল নাগরিকের জান মাল হরণ করে। যেমন কোন শত্রু শহরে পানি সরবারাহ বন্ধ করে দিয়ে যদি তাদের আত্মসম্পর্পন করানোর সম্ভাবনা থাকে তবে তা করা জায়জে।

বর্তমানে মুযাহিদিনরা যদি আমেরিকার সকল বিমান ভূপাতিত করে তবে তা ইসলামী আইনে গ্রহণযোগ্য সমর কৌশল। এতে পুরুষ বা নারী যেই নিহত হোক না কেন। তাই উমর আব্দুল মোত্তালিব বিমান উড়িয়ে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা ইসলামী আইনে জায়েজ ছিল। কেননা মুসলিমরা যদি আমেরিকার শুধুমাত্র এক বিমান ব্যবস্থা ধবংস করতে পারে তবে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। চিন্তা করুণ, বাংলাদেশে যদি কেউ তিন মাস সফল ও কড়া হরতাল করতে পারে তবে দেশের অবস্থা কিরূপ হবে? দেশ হয় ধবংস হয়ে যাবে নতুবা সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে। ঠিক তেমনি মুসলিমরা যদি আমেরিকার বেসামরিক

বিমান পরিবহন ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে পারে তবে তাদের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে নতুবা তাদের সরকার পররাষ্ট্র নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে। তাই অ্যামেরিকান বেসামরিক বিমান ধ্বংস করা ইসলামী আইনে অনুমদিত। কারণ অবরোধ এর চেয়েও নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া যেখানে অনাহারে নারী শিশু মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দুই, যদি নারী শিশু আলাদা করা না যায় তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। এখানে তায়েফে যে গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছে তা নারী শিশু পার্থক্য করতে পারত না। তাই যাত্রীবাহী বিমান ধ্বংস বা মেট্রোরেল ষ্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ, বিমান বন্দরের লবিতে হামলা সবই গ্রহণযোগ্য যুদ্ধ কৌশল ইসলামী সমর আইন অনুসারে। এই হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা হানাফী মাযহাবের আলোচনায় করা হয়েছে।

১৩.

ইরাক ও সিরিয়া বিজয়

খলিফাহ উমার রাঃ এর সময় যখন ইরাক বিজয় হল, তখন বিজয়ী মুসলিম সৈন্যদের পক্ষ থেকে দাবী করা হলে যে, 'আমরা আমাদের রক্তের বিনিময়ে জমি অধিকার করেছি। অতএব আপনি আমাদের মাঝে জমি বন্টন করে দিন এবং অধিবাসীদের গোলামে পরিণত করুণ।'

খেয়াল করুণ, এখানে সকল অধিবাসীকে গোলামে পরিণত করার দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু শরিয়াতে যুদ্ধরত কাফিরদের মধ্যে থেকে অস্ত্র বহনে সক্ষম সকলকে হত্যা বা গোলামে পরিণত করা যায়, তাই তারা অস্ত্র বহনে সক্ষম সকল কাফিরকেই গোলামে পরিণত করার দাবী জানিয়েছিল, চাই সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিক বা না নিক। তখন কেউ বলে নাই যে, একাংশের অপরাধের দায় কেন সকল ইরাকির উপর চাপান হচ্ছে। অতএব সাহাবায়ে কেরাম সকল কাফির যুবককেই যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু মনে করতেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত ইরাকি কাফির যুবকদের হত্যা করাও বৈধ ছিল। কিন্তু বনু কুরায়যা ছাড়া আর কোন যুদ্ধরত গোষ্টির সকল সদস্যকে হত্যা করার নযির নাই।

তবে উমার রাঃ তাদের এ দাবী গ্রহণ করেন নাই। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আব্দুর রহমান ইবন আওফ রাঃ এবং হযরত

বিলাল রাঃ ইরাকের সকল অধিবাসীকে গোলামে পরিণত করার পক্ষে মত দিয়েছিলন। কিন্তু আলি রাঃ, উসমান রাঃ, ইবন উমর রাঃ, তালহা রাঃ সহ সমস্ত বড় বড় আনসারী সাহাবী এ মতের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাদের মতে, দেশটাকে ভাগবাটোয়ারা করা এবং তার অধিবাসীদেরকে গোলামে পরিণত করা কোনভাবেই সংগত হবে না।

এ বিষয়ে উমার রাঃ বলেন, 'আমার মত এই যে জমি তার অমুসলিম অধিবাসীদের হাতেই রেখে দেই। অতঃপর তাদের জমির উপর খাজনা এবং তাদের উপর জিজিয়া বসায়। আর যদি তা না করে সিরিয়া, আলজেরিয়া, মিশর, বসরা, ও কুফার সকল জমি মুসলিমদের মধে ভাগ বাটোয়ারা করে দেই তবে কর্মচারিদের বেতন ও গরীবদের দৈনিক ভাতা কোথায় থেকে আসবে?' আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া।

খেয়াল করুন সকল ইরাকি কাফিরকে গোলামে পরিণত করা শরিয়তে জায়েজ কি নাজায়েজ- এই নিয়ে কোন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় নি। বিতর্কে উমর রাঃ এর যুক্তি ছিল, তাদেরকে গোলামে পরিণত করলে কর্মচারীদের বেতন ভাতা আসবে কোথা থেকে? এখান থেকে বুঝা যায় দারুল হারবের সকল অধিবাসীকেই গোলামে পরিণত করা যায়, শুধু যোদ্ধাদের নয়।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫১৩৪